শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন

ও

অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব

আলোচনা, বিশ্লেষণ ও অনুবাদ : শ্রীবিষ্ণুপদ পাণ্ডা

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

যিনি ভুবনেশ্বরের পুঁথিশালায় রক্ষিত মাধবের 'চৈতন্য বিলাস' পুঁথিখানির প্রতি সর্বপ্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, আমার পুঁথি সংক্রান্ত কাজের পেছনে যাঁর অফুরন্ত প্রেরণা ছিল আমার প্রধান অবলম্বন, সেই অগ্রজ-প্রতিম প্রয়াত প্রিয়নাথ সমাদ্দারের পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি উৎসর্গিত হলো।

সবিনয় নিবেদন

জ্ঞানের রাজ্যে শেষ কথা বলে কিছু নেই। সেখানে পুরনো ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন আর নতুন জ্ঞানের সংযোজন চলেছে অহরহ। আমার জীবনের সাত দশকের কিছু বেশি কালসীমার মধ্যে এর বহু প্রমাণ আমিই পেয়েছি। তাই যে ঘটনাকে গতকাল অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করেছিলাম আজ তাকে বর্জন করতে আমার একটুও বাধে না। জঙ্গম মননশীলতার এইটিই ধর্ম। স্থাবর হয়ে পড়লেই সে তার স্বচ্ছতা আর বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়।

শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনী নিয়ে আজও আমাদের উৎসাহের অন্ত নেই। কিন্তু নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যের অপ্রতুলতা আর অন্যদিকে ভক্তিবাদী রচনাগুলির অন্তর্গত অলৌকিক কাহিনীর বহুলতা, আমাদের পথে চিরদিনই বাধা হয়ে থেকেছে। তবু এসবের ভেতর থেকেই ঐ দেবোপম যুগ-পুরুষটির জীবন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ আর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সেগুলির মূল্যায়ন আজও অব্যাহত আছে।

চৈতন্যচরিতের মূল দুটি ভাগ—প্রাক্-সন্ন্যাস জীবন এবং পর-সন্ন্যাস জীবন। ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে—বিশ্বম্ভরচরিত এবং শ্রীচৈতন্যচরিত। বিশ্বম্ভরচরিতের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টারা সকলেই বঙ্গীয়, কিন্তু চৈতন্যলীলার দ্রষ্টাদের বড় অংশই ছিলেন উৎকলীয় ভক্তবৃন্দ। তাঁর জীবনের শেষ অঙ্কে বঙ্গীয় ভক্তদের সংখ্যা যে নিতান্তই অল্প ছিল এটিও আজ স্বীকার্য। এঁদের মধ্যে যাঁর রচনা আমাদের বড় অবলম্বন হতে পারতো, স্বরূপ দামোদরের সেই রচনাখানিই অন্তর্হিত হলো। মুরারি রেখে গেলেন বিশ্বম্ভরচরিত, যাতে পরবর্তীকালে বেশ কিছু অংশ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে—এ অভিমত বিশেষজ্ঞদের। ফলে চরিতকাব্য হিসেবে প্রধান স্থানে রইল শ্রীচৈতন্যভাগবত আর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। অন্য যে চার পাঁচখানি রচনা আমাদের আশ্রয়, সে সবই ভক্তি-মার্গের রচনা, শ্রীচৈতন্যের নীলাচল জীবনের কাহিনী সেগুলির মধ্যে যথেষ্ট নেই, যা আছে তার প্রায় বড় অংশটিই শোনা কথা। জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের তিরোধান সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যের খবর জানতেন কিন্তু তাকে লৌকিক আধারে পরিবেশন করায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে নিন্দিত। লোচন বিষ্ণুপ্রিয়া সংক্রান্ত কিছু বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী বর্ণনা করলেও সেগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলে উপযুক্ত সমাজে চিহ্নিত।

আজ মাধব পট্টনায়কের কাছে তাই শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু গবেষক সমাজ কৃতজ্ঞতা বোধ করবেন। জানা গেল, লোচনের বিষ্ণুপ্রিয়া বিষয়ক বর্ণনার উৎস মাধবেরই 'চৈতন্য বিলাস'—যার উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর গুরু গদাধর পণ্ডিতের কাছ থেকে। আর মাধবের দ্বিতীয় পুঁথি 'বৈষ্ণব লীলামৃত'-খানির উপাদান তিনি নিজেই সঞ্চয়

করেছেন ১৪৯৮-৯৯ থেকে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এই উপাদান সংগ্রহের কাজে তিনি যে সফল হয়েছেন তার মূলে ছিল রামানন্দের কাছে তাঁর আশ্রয় লাভ। বলাবাহুল্য, শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-লীলার অন্যতম প্রধান পরিকর এই রায় রামানন্দ। ফলে তাঁর প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী মাধব পট্টনায়ক চৈতন্যের ভক্তগোষ্ঠীর অন্যতমই হয়ে উঠেছিলেন। মাধবকে তাই নীলাচললীলার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা বলতে আমাদের দ্বিধা নেই।

মাধব কাহিনীগুলি কালানুক্রমিক ভাবেই পরিবেশন করেছেন আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাল-পরিচয়টিও রেখে গেছেন। তাই দু' একটি বিষয় ছাড়া বাকিগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি যাচাই করে নিতে কোন অসুবিধে হয়নি। আমি গ্রন্থখানির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি—এতো বেশি সাল-তারিখ উল্লেখ যুক্ত পুঁথি আমি অন্তত দেখিনি। যাই হোক, মাধব পট্টনায়ক তাঁর বৈষ্ণব লীলামৃত গ্রন্থে এমন বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন যেগুলি এতদিন অনুমানের স্তরেই রক্ষিত ছিল।

শ্রীচৈতন্যের তিরোধান এবং তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করার প্রকৃত স্থানটির উল্লেখ করে গিয়েও মাধব আমাদের ঋণী করেছেন। যাঁরা ওড়িষ্যার জগন্নাথ-সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুমাত্র তথ্য জানেন তাঁরা আজ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে 'কোইলী বৈকুণ্ঠে' 'সচল জগন্নাথে'র মরদেহটিকে সমাধিস্থ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যকে প্রকারান্তরে শ্রীজগন্নাথদেবের সমান পর্যায়েই উন্নীত করে গেছেন। কোইলী বৈকুণ্ঠে জীর্ণ দারু বিগ্রহগুলি সমাধিস্থ করার রীতি আজও অব্যাহত আছে। কোইলী বৈকুণ্ঠে শ্রীচৈতন্যের মরদেহ সমাহিত করে তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের দেহেই লীন হয়ে গিয়েছেন—এ ঘোষণা করা একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে অসত্যভাষণ নয়। তাছাড়া রায় রামানন্দ রাজা প্রতাপরুদ্রদেবকে যে যে কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন বলে জানিয়েছিলেন, সেগুলির সারবত্তাও সেকালের ঐতিহাসিক এবং সামাজিক পটভূমিতে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার্য। অবশ্য তথ্যগুলির ভিত্তিতে এ বিচারের ভার রইল পাঠকদেরই ওপর। আমার একমাত্র প্রত্যাশা, এরপর শ্রীচৈতন্যের 'তিরোধান রহস্য' উদ্ভাবনের তথাকথিত 'গবেষণা' থেকে এক শ্রেণীর গবেষক বিরত হবেন এবং দু'টি প্রদেশবাসীর মধ্যে আন্তরিক হৃদ্য সম্পর্কটুকু যাতে বজায় থাকে সেদিকে যত্নবান হবেন।

শ্রীমন্দিরের মধ্যে শ্রীচৈতন্যকে 'গুম খুন' করা হয়েছিল এই অভিমত সর্বপ্রথম প্রচার করেন ঐতিহাসিক ড. নীহাররঞ্জন রায়। ৫. ৮. ১৪ তারিখে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন, 'শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে গুম খুন করা হয়েছিল পুরীতেই এবং সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের দেহের কোন অবশেষের চিহ্নও রাখা হয়নি কোথাও। এবং তা হয়নি বলেই তিনটি কিংবদন্তী প্রচারের প্রয়োজনও হয়েছিল।' (দ্রঃ 'দেশ' ২৪শে মার্চ, ১৪৯৮, পৃঃ ৯, 'শ্রীচৈতন্য অন্তজীবনের সত্যান্বেষণে' গ্রন্থের বিজ্ঞাপন।) যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্য ছাড়াই ড. রায়ের মতো একজন খ্যাতিমান ঐতিহাসিক কোন মন্তব্য প্রকাশ করবেন, একথা

ভাবতে কষ্ট হয়। আর যদি তথ্য তাঁর হস্তগত হয়েছিল তবে একটি গ্রন্থই তিনি রচনা করতে বা কমপক্ষে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করতে পারতেন। তা তিনি করেননি, কারণ তা করার মতো উপাদান ছিল না। অথচ এই যে কল্পিত ইঙ্গিত তিনি করেন, তারপর সেই গুপ্ত খুনের মতবাদ প্রচারের কাজ কয়েকজন আজও নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছেন। এঁরা এবার নিরস্ত হবেন, এটিই আমার বিশ্বাস। এবং তা যদি হন, উভয় প্রদেশের পক্ষেই সেটা মঙ্গলকর হবে। কাল্পনিক অভিমত প্রচার গবেষণার ধর্ম নয়। এই সহজ সত্যটি এঁদের মনে রাখা প্রয়োজন।

মুদ্রিত 'বৈষ্ণব লীলামৃত' গ্রন্থখানি প্রথমে সংগ্রহ করেন শ্রীযুক্ত পতিতপাবন মহাপাত্র। তিনি পড়ে দেখার পর ওটি দেন উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. করুণাসাগর বেহেরাকে। আমারই বাসায় এক সন্ধ্যায় বিষয়টি আলোচিত হয় আর আমি ঐ গ্রন্থ অবলম্বনে একটি বাংলা গ্রন্থ রচনায় আগ্রহ প্রকাশ করি। পরদিন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মহাপাত্র ঐ গ্রন্থ এবং কয়েকটি সহায়ক গ্রন্থ সংগ্রহ করে দেন। গ্রন্থের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আমি প্রায়ই আলোচনা করি আমার প্রতিবেশী ড. বিচিত্রানন্দ মহান্তী ও শ্রীযুক্ত কৃত্তিবাস রূপের সঙ্গে। এঁদের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এতো দ্রুত গ্রন্থখানি কখনোই রচিত হতে পারতো না।

উড়িষ্যার সরকারি পুঁথিশালায় আমার পুঁথি নিয়ে কাজের আদি পর্ব থেকেই আমি শ্রদ্ধেয় ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সস্নেহ প্রশ্রয় পেয়ে এসেছি। আমার প্রথম সম্পাদিত পুঁথি দ্বারিকা দাসের 'মনসামঙ্গল'খানি তাঁরই প্রচেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। সেই স্নেহ যে আজও অক্ষয় আছে তারই প্রমাণ ড. বন্দ্যোপাধ্যায় আর একবার দিলেন, এই ক্ষুদ্রাবয়ব গ্রন্থখানির জন্য একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে। এতে আমার ঋণের বোঝাই বাড়লো।

গ্রন্থটি রচিত হলো দ্রুতবেগে। সমান দ্রুততার সঙ্গে কোন্ প্রকাশক একে মুদ্রণের জন্য গ্রহণ করবেন—এর জন্যে দুশ্চিন্তা অবশ্যই ছিল। তা থেকে মুক্তি দিলেন দে'জ পাবলিশিং-এর সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর দে। আমি অবশ্যই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। প্রদীপের আলোর পেছনে সলতে-পাকানোর অজ্ঞাত ইতিহাসের মতো সুধাংশুবাবুকে এই গ্রন্থখানির প্রকাশে প্রণোদিত করার জন্য যারা তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছিল, তাদের নামোল্লেখ না করলে আমি প্রত্যবায়গ্রস্ত হবো। এই যোগসূত্র স্থাপনের জন্য প্রয়াসী হয়েছিল পরম স্নেহভাজন অধ্যাপক শ্রীমান চিত্তরঞ্জন মাইতি, শ্রীমান ড. কৃষ্ণানন্দ দে আর আমারই মধ্যমেতর সহোদর শ্রীমান শক্তিপদ। তাদের আন্তরিক কুশল কামনা করি।

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

রোগগ্রস্ত শরীর নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে গিয়ে প্রথম সংস্করণের বইটিতে কিছু ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। শরীরের অবস্থা একই রকম তবে এবার সময় পেয়েছি অনেক বেশি। তাছাড়া কিছু চিঠিপত্র আর সমালোচনাও দেখেছি। এবার ত্রুটিগুলিকে যথাসম্ভব সংশোধন করে কিছু নতুন তথ্য আর পরিপোষক উপাদান যুক্ত করা হোল। কিছু কিছু অংশ বর্জিতও হোল।

শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে বঙ্গীয় পাঠককুলের অনুসন্ধিৎসা পাঁচশ বছর পরেও অক্ষুণ্ণ আছে। বিশেষ করে এঁর শেষ জীবন নিয়ে আলোচনা এখনো অব্যাহত আছে। এ যে আশা আর আনন্দের কথা তাতে সন্দেহ নেই। বিশ্বাস করি, এই ব্যাপক আলোচনা থেকেই নির্ভরযোগ্য সত্য বেরিয়ে আসবে। মাধবের পুঁথিই অভ্রান্ত আর তাঁর কথাই 'একমাত্র সত্য' এই উক্তি আমার নয়। হতেও পারে না। আমার মনটিকে আমি এখনো চলিষ্ণু রেখেছি তাই গ্রহণযোগ্য যে কোন মত পেলে পূর্বের ধারণা থেকে সরে আসতে আমার এক বিন্দুও বাধে না। আমি বিশ্বাস করি তত্ত্ব আর তথ্য এ দুটোকেই পরিবর্তনশীল সমাজমনস্কতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই এগিয়ে চলতে হয়। আর এই বিশ্বাসই আমার সব কাজকর্মের মৌল উপাদান। তাই কোন একটি ধারণাকে যাচাই না করে আঁকড়ে থাকতে আমার বাধে।

বিরূপ সমালোচনা আমি আনন্দের সঙ্গেই শুনি, খোলা মন নিয়ে। তবে এ প্রত্যাশাটুকু আমার থাকেই যে, সমালোচনার আগে আমার লেখাটি একটু যত্ন করে সমালোচক পড়ে নেবেন। আমি যা বলিনি বা যার ইঙ্গিতমাত্রও দিইনি এমন কথা আমার কলমের ডগায় বসিয়ে দেবেন না।

গৌড়ীয় আর উৎকলীয় বৈষ্ণবদের তত্ত্বগত বিরোধ ষোড়শ শতক থেকেই চলে আসছে। একে উৎকলীয় বৈষ্ণবদের 'বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের প্রতি বিদ্বেষ' কখনোই বলা যাবে না। এখানে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের কোন কথা নেই, আছে সম্প্রদায়ের অনুসৃত সাধ্য-সাধন প্রণালীর কথা। আর এ কোন নতুন কথা নয় যে ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা তাঁদের বিশ্বাসের ক্ষেত্র থেকে নড়ে বসতে চান না। তাই যা তাঁদের বিশ্বাসের অনুগত নয়, তা তাঁরা বর্জন করে চলেন। এতে সত্যই ক্ষুণ্ণ হয়। শ্রীচৈতন্যের জীবনচিত্র অঙ্কনের বেলায় বহুক্ষেত্রে এটিই ঘটেছে। তাই আমার মতো অনেকেই বিশ্বাস করেন যে এই মহামানবটির ছবি আঁকতে গিয়ে তাঁর মানবসত্তাটিকে অলীক কাহিনী দিয়ে ঢেকে দেওয়া কখনোই সঙ্গত নয়। ভালো মন্দ যাই হোক না কেন সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করাই আমাদের উচিত।

উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ফকীরমোহন দাস মাধবের

'চৈতন্যবিলাস' ছেপে বার করেছেন। ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে ইনি মাধব রথ এবং অষ্টাদশ শতকের মানুষ। তাঁর গুরু ছিলেন 'মহীতীর্থ'। চৈতন্যবিলাসে কবি যে 'গদাধর গুরু মহেশ্বর' বলেছেন তাতে 'মহীতীর্থ'ই 'মহেশ্বর' বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছেন। তিনি বৈষ্ণবলীলাকৃত পুঁথিকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেননি কিন্তু কেন করেননি তার কোন কারণই দেখাননি। তাই এ সম্পর্কে আলোচনার কোন সুযোগই নেই।

ডঃ চিত্রা দেব গ্রন্থখানির সমালোচনায় বলেছেন যে ওড়িষ্যাবাসী ও বঙ্গবাসী ভক্তদের মধ্যে বিরোধের কোন কারণ তিনি পাননি। এর কারণগুলি গ্রন্থের মধ্যেই আলোচিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য 'সমকালীন রাজনীতির সঙ্গে' মোটেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেননি আর 'তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র'ও করা হয়নি। এ সবের বিন্দুমাত্রও সমর্থন কোন গ্রন্থে মেলে না। ডঃ দেব একথাও জানেন যে জয়ানন্দ-লোচন-বাসু ঘোষ এঁরা চৈতন্য-সমকালীন হলেও নীলাচল-লীলার 'প্রত্যক্ষদর্শী' নন। মাধব প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। আমার শক্তিতে যতোখানি তন্নিষ্ঠ বিচার সম্ভব তা আমি করে দেখেছি। আমি তাই বিশ্বাস করি নতুন তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত মাধবের উক্তিগুলিকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

ভূমিকা

ডক্টর শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ পাণ্ডা বাংলা গবেষণাসাহিত্যে অতি সুপরিচিত, তাঁর পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্য উড়িষ্যার গবেষক ও বিদগ্ধ পণ্ডিতরাও বিশেষভাবে প্রশংসা করে থাকেন। ড. পাণ্ডা দীর্ঘকাল ভুবনেশ্বরে বাস করে ওড়িয়া ভাষা প্রায় মাতৃভাষার মতো আয়ত্ত করেছেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল ওড়িয়া হরফে লেখা বাংলা কাব্য, যেগুলি ভুবনেশ্বর প্রদর্শশালা থেকে পাওয়া গেছে। একদা উড়িষ্যা ও বাংলাদেশ একই শাখায় দুটি ফুলের মতো বিকশিত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের শেষার্ধ পুরীধামে অতিবাহিত হয়েছে। উড়িষ্যার ধনী অভিজাত, রাজা ও দীনদরিদ্র সকলেই তাঁকে দেবতার মতো ভক্তি করতেন। উড়িষ্যা ও বাংলার ভ্রাতৃত্ববন্ধন তাঁর দ্বারাই দৃঢ়ত্ব লাভ করেছিল। শ্রীজগন্নাথের পুণ্যভূমি নীলাচল বাঙালির শ্রেষ্ঠ তীর্থ। সুতরাং বাংলার সঙ্গে উড়িষ্যার সম্পর্ক অনেক প্রাচীন। অনেক বাঙালি তীর্থদর্শনে গিয়ে উড়িষ্যায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন, কেউ বা কর্মব্যপদেশে বাস্তু বেঁধেছেন। অনেক বাঙালি উড়িষ্যায় বসবাস করে ওড়িয়া ভাষাকে মাতৃ-ভাষারূপে গ্রহণ করেছেন, কেউ কেউ ওড়িয়া ভাষায় কাব্য রচনা করে ওড়িয়া সাহিত্যকে ঐশ্বর্যশালী করেছেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় পর্যন্ত বহু বাঙালি ওড়িয়া সাহিত্যের বিকাশে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। রঙ্গলাল উড়িষ্যায় প্রথম সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' তিনি ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর 'কাঞ্চীকাবেরী' প্রাচীন ওড়িয়া কবি মাগুনি দাসের প্রেম-ভক্তি ও ঐতিহাসিক কাব্য অবলম্বনে রচিত। সুতরাং বাংলা ও উড়িষ্যা শুধু প্রতিবেশী নয়, একের সঙ্গে অপরের গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক। ড. শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ পাণ্ডা সেই আত্মীয়তার সূত্রে আরো কয়েকটি সূত্র সংযোজনা করে উভয় ভাষার নৈকট্য সাধন করেছেন।

বক্ষ্যমান পুস্তিকাটিতে ড. পাণ্ডা শ্রীচৈতন্যদেব ও নীলাচলভক্তসম্প্রদায় সম্বন্ধে যে তথ্য উপস্থাপিত করেছেন তার ফলে সমগ্র চৈতন্যজীবনকথাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা প্রয়োজন। একালে যাকে জীবনী বলা হয়, অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের বাস্তব জীবনকথা—প্রাচীন ও মধ্যযুগে তাকে বলা হত জীবন-চরিত, অর্থাৎ কোনো মহাপুরুষের দিব্যজীবনকথা। বাস্তব জীবন ও দিব্যজীবনের মধ্যে 'বহুত অন্তর'। সুতরাং **hagiography** থেকে **bio-graphy**-র নিরেট বাস্তব সত্য আশা করা যায় না। তাই মধ্যযুগে বাংলাদেশে সংস্কৃত ও বাংলায় যে সমস্ত চৈতন্য চরিতকাব্য লেখা হয়েছে তাতে প্রতিদিনের বাস্তব ঘটনার বাহুল্য নেই। শ্রীচৈতন্যের ভাবমূর্তি ফোটাতেই গৌড়ীয় ভক্তেরা বেশি উদ্‌গ্রীব ছিলেন। নীলাচলে মহাপ্রভুর জীবনের শেষার্ধে অতিবাহিত

হয়েছে। উড়িষ্যার সর্বশ্রেণীর মানুষ তাঁকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তি করতেন, শ্রীচৈতন্যদেবও তাঁর ওড়িয়া ভক্তদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। ফলে তাঁর গৌড়ীয় ভক্তেরা অভিমানে পুরীধাম ত্যাগ করে গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। এসব কৌতূহলজনক ব্যাপার একালের গবেষকদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর করে তুলবে। পুরীর ওড়িয়া ভক্ত এবং গৌড়ীয় ভক্তদের সম্পর্ক, বিবাদ, মনোমালিন্যের কারণ ইত্যাদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা প্রয়োজন। সেই আলোচনার দ্বার উন্মোচন করলেন ড. পাণ্ডা।

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক মাধব পট্টনায়ক নামে চৈতন্যভক্ত ওড়িয়া কবি মহাপ্রভুকে অত্যন্ত নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মাধব দু'খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, 'চৈতন্যবিলাস' (১৫১৬ খ্রীঃ অঃ) এবং 'বৈষ্ণবলীলামৃত' (১৫৩৫ খ্রীঃ অঃ)। শ্রীচৈতন্য সম্পর্কিত তথ্যবিচার, তত্ত্বনির্ণয় ও শ্রীচৈতন্য প্রচারিত সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে গেলে এই দুখানি ওড়িয়া কাব্য বিশেষ প্রয়োজন। গৌড়ীয় গ্রন্থে যেখানে ফাঁক আছে, এই দুই ওড়িয়া গ্রন্থ অবলম্বন করে সে শূন্যতা পূরিয়ে দেওয়া চলে। তার প্রধানতম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মহাপ্রভুর তিরোধান। বঙ্গীয় প্রামাণিক চৈতন্য-জীবনকাব্যে এ-বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। তাঁর মর্ত্যকায়া ত্যাগের ঘটনাটিকে জয়ানন্দ বাস্তব ও স্বাভাবিক ভাবেই বর্ণনা করেছেন, তাই কোনো কোনো ভক্ত জয়ানন্দ-পরিবেশিত তথ্যকে প্রামাণিক বলে মানতে চান না। কিন্তু এই ঘটনাকে ওড়িয়া ভক্তকবি মাধব পট্টনায়ক যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের ঘটনাকে আবার নতুনভাবে পর্যালোচনা প্রয়োজন। এই আলোচনায় ড. পাণ্ডা সমস্ত তথ্য প্রমাণ উপস্থিত করে সমস্যার যুক্তিপূর্ণ সমাধান করতে চেয়েছেন। বলাই বাহুল্য এসব ধর্মীয় ব্যাপারে কখনো ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় না। কিন্তু যুক্তিকে যদি ভক্তির চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়, তাহলে বিষ্ণুবাবুর অভিমত যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখা উচিত। আমাদের বিশ্বাস, তাঁর আলোচনা পণ্ডিত, গবেষক ও ভক্তদের নানা দিক থেকে সচেতন করে তুলবে। সত্যনির্ধারণ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। সেদিক থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের শেষজীবন সম্বন্ধে ড. পাণ্ডা কয়েকটি নতুন সমস্যা ও তার সমাধানের সূত্র নির্দেশ করেছেন। বাংলা ও উড়িষ্যার বিদ্বজ্জন এ-বিষয়ে যথেষ্ট কৌতূহলী হবেন তাতে সন্দেহ নেই। গ্রন্থটির বহুল প্রচার একান্ত কাম্য।

শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন
ও
অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব

সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তী কালটুকুর অধিকাংশ অংশ শ্রীচৈতন্য পুরীধামে জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর বিশিষ্ট বৈষ্ণবদর্শন উৎকলীয় ভক্ত ও পণ্ডিতসমাজ গ্রহণ যদি নাও করে থাকেন, ওড়িষ্যার সমকালীন বা অব্যবহিত পরবর্তী সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রসঙ্গ বিশদভাবেই থাকবে, এটিই প্রত্যাশিত। কিন্তু সমকালীন রচনা হিসেবে কাহাই খুণ্টিয়ার 'মহাভাব প্রকাশ', পঞ্চসখার অন্যতম অচ্যুতানন্দ দাসের 'শূন্য সংহিতা', রায় রামানন্দের শিষ্য শ্রীহরিদাস প্রণীত 'ময়ূর চন্দ্রিকা' ছাড়া চতুর্থ কোন গ্রন্থের তথ্য আমাদের জানা ছিল না। দিবাকর দাসের 'জগন্নাথ চরিতামৃত', ঈশ্বর দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', ভগবান দাসের 'শ্রীগৌরাঙ্গ ভাগবত', ভক্ত চরণ দাসের 'মনঃশিক্ষা' প্রভৃতি ওড়িয়া ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলি সপ্তদশ আর অষ্টাদশ শতকের রচনা। তাছাড়া ঈশ্বর দাস এবং ভগবান দাসের রচিত দু'টি গ্রন্থ বাদ দিলে, বাকীগুলির মূল প্রসঙ্গ চৈতন্যচরিত নয়। তেমনি ষোড়শ শতকের 'শূন্য সংহিতা' বা 'জগন্নাথ চরিতামৃত'ও নয়। 'মহাভাবপ্রকাশ' যে পুঁথি থেকে মুদ্রিত হয়েছে, সে পুঁথিটিও খণ্ডিত। তাই শ্রীচৈতন্যের নীলাচলবাসকালীন ঘটনাবলীর পূর্ণাবয়ব আলেখ্য আমরা পাইনি।

প্রয়াত পদ্মশ্রী সদাশিব রথশর্মা 'শ্রীচৈতন্যচকড়া' নামে একটি ওড়িয়া পুঁথি প্রয়াত স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজের সহায়তায় বঙ্গাক্ষরে বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করেন। ১৯৮৮ সালে পুঁথিটির পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে যে বিপুল প্রচার চালানো হয়, তাতে আকৃষ্ট হয়ে আমি গ্রন্থটি সংগ্রহ করি। যে পুঁথিটি অবলম্বন করে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছিল সেটি একটি অনুলিপির (১৬৪৪ শকাব্দ) অনুলিপি (১৭৪৪ শকাব্দ)। এটি উদ্ধৃত হয়েছে এইভাবে— 'সার্বভৌমাশ্রম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রবাসিন শ্রীরসিকরাজ শরণম্‌ওঁ, শাকে ১৬৬৪ ভাদ্রপদ অষ্টম্যাম্‌ সম্পূর্ণ পুস্তক পাঠান্তর ১৭৪৪।' পুঁথিটি শ্রীগোবিন্দ দাস বাবাজী রচিত এবং তাতে শ্রীচৈতন্যদেবের

জীবনসংক্রান্ত মোট ৫৪টি লীলার বিবরণ দেওয়া আছে। গোবিন্দ দাস মহাপ্রভুর সমকালীন কিন্তু সমস্ত লীলার প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা নন, অন্যান্যদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে লেখা। এই গ্রন্থটি ওড়িষ্যায় প্রচারিত হয়নি। আমি গ্রন্থখানির প্রামাণিকতা সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করে শ্রীযুক্ত রথ-শর্মাকে পত্র দিই। তিনি কোন এক সময় এসে ঐগুলি নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন, কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। এই গ্রন্থ সম্পর্কে ঐ বছরই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (২-৪ সংখ্যা) শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য 'মহাপ্রভুর অপ্রকটের নতুন কাহিনী শ্রীচৈতন্যচকড়া' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে গ্রন্থ-খানির প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় জীবদ্দশায় পণ্ডিত রথশর্মা কোন একটি সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করেননি কারণ তা সম্ভবও ছিল না। যাই হোক, ওড়িয়া ভাষায় বা সংস্কৃত ভাষায় রচিত (পণ্ডিত গোবিন্দ মিশ্র রচিত, 'গৌর কৃষ্ণোদয়') কোন গ্রন্থই শ্রীচৈতন্যের নীলাচললীলার নির্ভরযোগ্য সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে পারেনি। অষ্টাদশ শতকের প্রখ্যাত কবি সদানন্দ কবি সূর্যব্রহ্মার 'বিশ্বম্ভর বিহার' ও নয়।

যেখানে তথ্যের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থাকে, সেখানেই জন্ম নেয় বহু কল্পিত কাহিনী। আবার যে ক্ষেত্রে কোন কাহিনীকে অলৌকিক আধারে পরিবেশনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলে, সেখানে জল্পনা-কল্পনার অন্ত থাকে না। এর একটি অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ শ্রীচৈতন্যের জীবন।

আমরা এ পর্যন্ত ওড়িষ্যায় রচিত শ্রীচৈতন্যজীবনী সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছি। বঙ্গভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির উল্লেখও এ প্রসঙ্গে অপরিহার্য। কালানুক্রমিকতা রক্ষা করে তালিকাটি তুলে ধরতে হলে প্রথমেই নাম করতে হয় মুরারি গুপ্তের 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতং' বা কড়চার কথা। এটি তিনি ৬৪ বছর বয়সে ১৪৫৫ শকাব্দের আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে রচনা শেষ করেন। মোট চারিটি প্রক্রমে বিভক্ত ৭৮টি সর্গে তিনি ১৯২৭টি শ্লোক রচনা করেছেন। তিনি বলেছেন

(১।১।১৫-১৭), গয়ায় পিণ্ডদান আর মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের পর যখন বিশ্বম্ভরের অধ্যাত্মজীবন শুরু হয় তখনই দামোদর পণ্ডিত কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তিনি এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। এটি যে আকারে পাওয়া যায় তার বড় অংশ সম্পর্কেই সন্দেহের অবকাশ আছে।

পরবর্তী রচনা কবি কর্ণপুরের (পরমানন্দ দাস) 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃতম্'। এটি কুড়িটি সর্গে বিভক্ত, ১৯১১টি শ্লোকের সমাহার। রচনার সমাপ্তি ঘটে ১৪৬৪ শকে আষাঢ় মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে। এই মহাকাব্যখানি রচনার সময় কবির বয়স ১৭।১৮ বছরের বেশি ছিল না। কারণ বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস গ্রহণের ৬।৭ বছর পর এঁর জন্ম হয়। কিন্তু এঁর রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্' চরিত-নাটকটি বহু পরবর্তী রচনা। এটি সমাপ্ত হয় ১৪৯৪ শকাব্দে। কবি কর্ণপুরের এই দুটি গ্রন্থ রচনার মধ্যবর্তীকালে জয়ানন্দ, বৃন্দাবন দাস এবং লোচনের গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের সহচর আরও দু'জনের কথা এখানে উল্লেখনীয়। একজন গোবিন্দ কর্মকার এবং অন্যজন স্বরূপ দামোদর (পুরুষোত্তম আচার্য), এঁরা উভয়েই সেবক হিসেবে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ছিলেন আর দুজনেই দু'টি কড়চা রচনা করেছিলেন। গোবিন্দ কর্মকারের কড়চাখানির প্রামাণিকতা নিয়ে প্রচুর বাদ বিসংবাদ হয়েছে এমন কি একথাও বলা হয়েছে ওটি পুরোপুরি জয়গোপাল গোস্বামীর কল্পনাপ্রসূত। (বিমান বিহারী মজুমদার, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, কঃ বিঃ, ২য় সংস্করণ ১৯৫৯, পৃঃ ৪০৪)। সুখের কথা এই কড়চাখানির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে ড. নির্মলনারায়ণ গুপ্ত 'শ্রীচৈতন্য গোবিন্দ কর্মকারের দৃষ্টিতে' শীর্ষক যে গবেষণাপত্র প্রস্তুত করেছিলেন (১৯৮৩, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি. লিট. উপাধির জন্য প্রদত্ত) তা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তিনি প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে গোবিন্দ রচিত মূল কড়চাখানি একটি প্রামাণিক রচনা এবং ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময় এটির রচনা সমাপ্ত হয়।

স্বরূপ দামোদরের মূল রচনা যে পাওয়া যায় না, এ বিষয়ে

চৈতন্যচরিত বিশেষজ্ঞেরা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। অথচ কবিরাজ গোস্বামী তাঁর 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে' লিখেছেন—

গার্হস্থ্যে প্রভুরলীলা আদিলীলাখ্যান।
মধ্য-অন্ত্য-লীলা শেষলীলার দুই নাম ॥
আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥
প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥
এই দুইজনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥
(১৩শ পরিচ্ছেদ, ১ম শ্লোক)

আমি বিশ্বভারতী পাঠাগার থেকে 'আশ্রয় কল্পতরু' বা 'গোস্বামী প্রবর স্বরূপ দামোদরের কড়চা'র দু'টিভাগ (কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনুবাদিত), ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি বিভাগ থেকে ৬৫৮৫ ও ৬৫৮৬ সংখ্যক দু'টি পুঁথি এবং এশিয়াটিক সোসাইটির পাণ্ডুলিপি বিভাগ থেকে ৫৩৫৩ সংখ্যক পুঁথির প্রতিলিপিগুলি সংগ্রহ করে দেখেছি। মুদ্রিত গ্রন্থ 'আশ্রয় কল্পতরুর' সঙ্গে হস্তলিখিত পুঁথিগুলির কোন সাদৃশ্য নেই অথচ হস্তলিখিত পুঁথিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। এগুলির মধ্যে চৈতন্যলীলার তবু কিছু বিবরণ আছে যা 'আশ্রয় কল্পতরু'র মধ্যে নেই। পুঁথিগুলি পয়ারে রচিত এবং মধ্যলীলার কিছু তথ্য এগুলির মধ্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ গোস্বামীর পরম শ্রদ্ধেয় রচনা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল নিয়ে কিঞ্চিৎ মতপার্থক্য থাকলেও এটি যে সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদের মধ্যেই রচিত, তাতে সন্দেহ নেই। আমরা আর একখানি চরিত গ্রন্থের শুধু নামোল্লেখই করছি, সেটি চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়'। ড. সুকুমার সেনের মতে গ্রন্থটি ১৫৪২-৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। এখানি খুঁটিয়ে পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তাই এই চরিত গ্রন্থখানি সম্পর্কে আলোচনা থেকে বিরত থাকছি।*

* বইখানি সংগ্রহ করেছি। খণ্ডিত বই পুঁথিখানিতে তেমন কিছু নতুন তথ্য নেই।

॥ ২ ॥

ওড়িষ্যা রাজ্য পুঁথিশালায় আমার সুনির্দিষ্ট কাজ ছিল ওড়িষ্যার কবিদের রচিত বাংলা কাব্যগুলির লিপ্যন্তরণ ও সম্পাদনা। পুঁথি-গুলি সবই তালপাতার এবং সেগুলির লিপিরূপ ছিল ওড়িয়া। স্বভাবতই ওড়িয়া কবিদের ওড়িয়া ভাষায় রচিত কাব্যগুলি সম্পর্কে আমার অনুসন্ধিৎসা ছিল না বললেই হয়। সনাতন ভণিতায় একটি ক্ষুদ্রাবয়ব শ্রীচৈতন্য সম্পর্কিত পুঁথি (ও. এল, ৫৪৮ বি) পাই। মোট ৭৯ পৃষ্ঠার পুঁথি আর প্রতিটি পৃষ্ঠায় ছত্র সংখ্যা চার। পুঁথির প্রারম্ভে কোন কাব্যনাম ব্যবহৃত হয়নি কিন্তু অন্ত্যশ্লোকটি হোল—

চৈতন্যচরণে সভা লইআ শরণ।
প্রকাশ চৈতন্য রত্ন কহ সনাতন॥

ইতি শ্রীপ্রকাশচৈতন্যরত্ন সমাপ্ত।

এখানি ঐ 'প্রকাশচৈতন্যরত্ন' নামেই প্রকাশিত (মারাং বুরু-প্রেস, মেচেদা, মেদিনীপুর, ১৮৮৭) হয়েছে। এটির একটি স্বল্পাক্ষর ভূমিকায় ড. সুকুমার সেন পুঁথি রচনার কাল ১৮শএর পূর্বে নয় বলেছেন আর লেখকের 'ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্বের' ভাবনা দেখে এঁকে শ্যামানন্দী সম্প্রদায়ের মানুষ বলে অনুমান করেছেন। যাই হোক, পুঁথিটিতে নতুন কোন তথ্য নেই, শ্রীচৈতন্যর নবদ্বীপ-লীলারই কিছু বর্ণনা এর মধ্যে আছে তবে এঁর বর্ণনাগুলির সমর্থন চৈতন্যভাগবতে মেলে। চৈতন্যভাগবতের বহু পরবর্তী রচনা এটি এতে সন্দেহ নেই এবং ইনি বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ পাঠ করেছেন এ অনুমানেও বাধা নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, বহু মধ্যযুগীয় প্রসিদ্ধ বাংলা মঙ্গলকাব্য এবং চৈতন্যচরিত কাব্য ওড়িয়া লিপিতে লিপান্তরিত এবং তালপাতায় লিখিত হয়েছিল। স্বভাবতই এগুলির পাঠকগোষ্ঠী ছিলেন ওড়িষ্যার বাংলালিপি পঠনে অক্ষম পাঠকেরা। বৃন্দাবনদাসের এরকম একটি 'চৈতন্যমঙ্গল' (বি. ২২৯) রাজ্য পুঁথিশালায় আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ওড়িয়া লিপিতে তালপাতার পুঁথি (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) আছে ছাব্বিশখানি।

আগেই বলেছি, ওড়িষ্যার কবিদের অপ্রকাশিত ওড়িয়া ভাষায় পুঁথির দিকে মনোযোগ দেবার অবকাশ আমার ছিল না। আমার সামনে এঁদের বাংলা ভাষায় রচিত প্রায় পাঁচশ' পুঁথি তখন আমাকে অভিনিবিষ্ট রেখেছে। কোন্‌গুলি বিশেষ মূল্যবান পুঁথি, সেগুলিকে বেছে নিয়ে তার লিপ্যন্তরণ এবং সম্পাদনার কাজেই আমি আমার প্রায় সবটুকু শক্তি নিয়োজিত রেখেছি।

১৯৮৩ যালে ভুবনেশ্বরবাসী অগ্রজপ্রতিম প্রিয়নাথ সমাদ্দার 'ওড়িয়া সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য' এবং 'রাধাকৃষ্ণলীলা' সহ সালবেগ এবং আদিবাসী কবি ভীমভোই সম্পর্কে মোট চারিটি প্রবন্ধ আমাকে পড়ে দেখার জন্য দেন। এই বয়োবৃদ্ধ মানুষটির জ্ঞানতৃষ্ণা এবং অধ্যবসায় ছিল অননুকরণীয়। তিনিও রাজ্য পুঁথিশালায় গিয়ে পুঁথিপত্রের সন্ধান করতেন এবং নতুন তথ্যের সন্ধান পেলে সেগুলি নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনাও করতেন। তাঁর ঐ প্রবন্ধ চতুষ্টয় 'অমৃতরসাবলী' নামে (ভারতী বুক স্টল, ১৩৯০) প্রকাশিত হয়েছে। প্রয়াত প্রিয়নাথ সমাদ্দারই আমাকে জানান যে মাধব রথ নামক এক ওড়িয়া কবির চৈতন্য সম্পর্কিত দু'টি ওড়িয়া ভাষায় পুঁথি (ও. এল. ৬১৮/৯৪৫) তিনি পুঁথিশালায় দেখেছেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধে এই পুঁথিগুলির বিষয়ও স্থান পেয়েছে।

ড. বিমান বিহারী মজুমদার তাঁর 'শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান' গ্রন্থে মাধবের পুঁথি নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন (কঃ বিঃ ২য় সংস্করণ, ১৯৫৯, পৃঃ ২৭৪-৮৫) এটি আমার দেখা ছিল। তবু ঐ দুটি পুঁথি সংগ্রহ করে পড়ে দেখি এবং ড. বিমানবিহারী মজুমদারের আলোচনাটিও খুঁটিয়ে পড়ি, বিষয়টি তাঁর গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তিনিও চৈতন্যবিলাস পুথি পড়েছিলেন কিন্তু 'মাধব কে?' এই প্রসঙ্গে বলেছেন 'তিনখানি বৈষ্ণববন্দনাতেই (দেবকীনন্দন, বৃন্দাবন দাস ও শ্রীজীব গোস্বামী) মাধব পট্টনায়ক নামে একজন ভক্তের নাম পাওয়া যায়। তাহা হইতে বুঝা যায় যে ঐ নামের একজন ভক্ত শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন ও ভক্তদলের মধ্যে কোন কারণে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু চরিতগ্রন্থে উড়িয়া মাধবের নাম নাই—অনেক উড়িয়া ভক্তের নামই বাঙ্গালা চরিত গ্রন্থসমূহে নাই।' (তদেব, পৃঃ ২৭৪)। ওড়িষ্যার

যে সব চৈতন্যভক্ত ব্রজের ভজনপ্রণালী গ্রহণ করেননি তাঁদের কারও নামই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যে নেই। তাছাড়া গৌড়ীয় এবং উৎকলীয় ভক্তদের মধ্যে যে বিরোধ ছিল (তদেব, পৃঃ ৫০৪) এটিও ঐতিহাসিক ঘটনা।

অবশ্য চৈতন্যবিলাস পুঁথি (ও. এল. ৬১৮) একটি সমস্যা সৃষ্টি করেছে। ঐ পুঁথির ৯৫ পৃষ্ঠায় আছে 'কহই মাধব রথ করিআ রোদন। সমস্ত ঈশ্বর সে শচীর নন্দন।' অতএব ইনি 'মাধব পট্টনায়ক' নন 'রথ' উপাধিধারী ব্রাহ্মণ কবি, স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়।

ড. বিমান বিহারী মজুমদার দেখেছেন যে এই মাধবের 'চৈতন্যবিলাস'খানিতে কবি তাঁর গুরু হিসেবে গদাধর পণ্ডিতের নামোল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—

বন্দই যে গদাধর গুরু মহেশ্বর।
সে পাদকমলে চিত্ত রবু মাধবর হে॥

অতএব এই কবি মাধব যে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন, এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণের অবকাশই নেই। বিমানবাবুর সমস্যা হয়েছে মাধবের রচনার সঙ্গে লোচনের রচনার বহু সাদৃশ্য। মাধবের এই 'চৈতন্যবিলাসের' বর্ণনীয় বিষয় মাত্র একটি এবং কবি সে বিষয়টি শুরুতেই ঘোষণা করেছেন, বলেছেন—

যেতে চরিত্র গৌরর
শিব আদি অগোচর
ঠাকুর লোচনে এহা কলে প্রকাশ।
তাহাঙ্ক ভাষারু মুহিঁ
লেখিলি ভক্তিরে সেহিঁ
কহিলি প্রভুর সন্ন্যাস রস বিলাস॥
ভক্তগণ ন ঘেন দোষ।
কহই মাধব তুম্ভ পাদরে আশ॥

উদ্ধৃত কবিতাংশের তৃতীয় ছত্রটি বিমানবাবুকে বিভ্রান্ত করেছে। 'ঠাকুর লোচনে' এটির ওপরই তিনি গুরুত্ব আরোপ করে ধরে নিয়েছেন যে মাধব লোচনের চৈতন্যমঙ্গল থেকেই বহু অংশ

ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করে নিয়েছেন। দুই কবির রচনার মধ্যে অবিকল সাদৃশ্য আছে, এমন বেশ কিছু অংশ তিনি তাঁর ঐ দশম অধ্যায়ে তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত তিনি মুরারি গুপ্তের কড়চা থেকেও কিছু অংশ উদ্ধৃত করে সেখানিও যে লোচনের আকরগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তা দেখিয়েছেন। কে কাকে অনুসরণ করেছেন, মাধব লোচনকে না লোচন মাধবকে, এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'মাধব যদি লোচন হইতে অনুবাদ করিতেন তাহা হইলে তিনি কি মুরারি ও লোচনের "সাধু যেন নৌকা চড়ি যায় দূর দেশ" ও "জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে পোষণ" এই দুইটি উপমা বাদ দিতেন?' (তদেব, পৃঃ ২৭৯)

লোচন যে সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক ছিলেন আর রায় রামানন্দ রচিত 'জগন্নাথবল্লভ নাটকে'র বাংলায় ভাবানুবাদ করেছিলেন, একথা বিমানবাবু উল্লেখ করেছেন আর এও বলেছেন যে স্বভাবতই 'উড়িষ্যায় লিখিত বই তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না।' (তদেব পৃঃ ২৭৭) মাধবের পুঁথিতে যে সব বর্ণনা আছে 'তাহার সত্যতা নির্ভর করে মাধবের বই সত্যই গদাধর পণ্ডিতের নিকট শুনিয়া লেখা কিনা তাহার উপর' (তদেব, পৃঃ ২৮৪)—বিমানবাবুর এই উক্তি বেদনাদায়ক। মাধব স্বয়ং তাঁর গুরুর মুখ থেকে শুনে লিখেছেন—একথাই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এরপরও তাঁর বিবৃত ঘটনাবলী সম্পর্কে সন্দেহপোষণ অবশ্যই সুবিবেচনার কাজ নয়।

"ঠাকুর লোচনে" কথাটিকে কোনক্রমেই 'চৈতন্যমঙ্গল' রচয়িতা লোচনদাস ঠাকুর বলে গ্রহণ করা যায় না। লোচনদাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৪৪৮ শকাব্দে। মাধব প্রকৃতপক্ষে তার পাঠকদের যে বিশেষ কথাটি বোঝাতে চেয়েছেন তা হোল, তাঁর গুরু গদাধর পণ্ডিত যে সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং যা যা তিনি তাঁর মাতৃভাষায় শিষ্য মাধবের কাছে বর্ণনা করেছিলেন, সেই কথাগুলিই মাধব তাঁর নিজস্ব মাতৃভাষা ওড়িয়ায় লিখে গেছেন। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, লোচন মাধবের গ্রন্থ থেকে বহু অংশ একেবারে আক্ষরিক অনুবাদে নিজের চৈতন্যমঙ্গলে স্থান দিয়েছেন। বিমানবাবুর বইতে এই ধরণের কিছু উদাহরণ আছে। আমি এখানে আরও কিছু উদাহরণ পাঠকদের বিচারের জন্য তুলে

ধরছি। কিন্তু তারও আগে মাধবের কোন্ কোন্ 'ছান্দ' লোচনের কোন্ কোন্ অধ্যায়ে অনুবাদিত হয়ে এসেছে তার একটি সূচী তুলে ধরি—.

মাধবের দ্বিতীয় ছান্দ এসেছে লোচনের মধ্যখণ্ডের দশম অধ্যায়ে।

তৃতীয় ছান্দ এসেছে — — একাদশ অধ্যায়ে।

চতুর্থ ও পঞ্চম ছান্দ এসেছে — — দ্বাদশ অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ ও অষ্টম ছান্দ এসেছে — — ত্রয়োদশ অধ্যায়ে।

এবারে অনুবাদের কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি ঃ—

(ক) অনল পরায়ে লাগুঅছি জননী। গরল মানুছি
তুম্ভামনঙ্ক বাণী ॥
কৃষ্ণবিনু জীবন জীব ন লেখি। কি কর্ম্ম জনম তাকু পশুরে
লেখি ॥
কৃষ্ণবিনু কর্ম্ম বিপ্রে বেদবিহীন। পতিহীন নারী বারি
বিহীনে মীন ॥
ধনহীনে গৃহে নাহি কিছিহিঁ কার্য্য। বিদ্যাহীনে বসে যেহে
সভা সমাজ ॥
এহিমতি কৃষ্ণবিনু অধন্য প্রাণ। আউ যেতে কহ তা ন শুনে
শ্রবণ ॥
ধরিবি মুঁ যোগীবেশ যিবি বিদেশ। যহিঁ ভেট পাইবি মুঁ
জীবনঈশ ॥
(মাধব—২।৩১-৩৬)

* * *

অগ্নিহেন লাগে মোর সে-হেন জননী। বিষ মিশাইল যেন
তো সভার বাণী ॥
কৃষ্ণ-বিনু জীবন—জীবনে না লেখি। কি কাজ এ ছার
জীবে যেন পশুপাখী ॥
মড়ার যে হেন সব্ব অবয়ব আছে। জীবকে জীয়ায় যেন
লতা পাতা গাছে ॥
কৃষ্ণবিনু ধর্ম্ম কর্ম্ম, দ্বিজ-বেদহীন। পতি-বিনু যুবতী যেন,
জলবিনু মীন ॥

ধনহীন গৃহারম্ভে নাহি কিছু কাজ। বিদ্যাহীন বৈসে যেন
বিদ্বান সমাজ ॥
কৃষ্ণের বিরহে মোর ধক্ ধক্ প্রাণ। আর যত বোল তা না
সাম্ভায়ে কান ॥
ধরিয়া যোগীর বেশ যাব দেশে দেশে। যথা গেলে পাঙ্
প্রাণনাথের উদ্দেশ্যে ॥
(লোচন—২।১০।১২৬-৩২)

(খ) প্রবোধ বচন কহি তোষিলে তাহারে। গলে মুরারি গুপত
ঘরকু সন্ধ্যারে ॥
হরিদাস সঙ্গ করি মুরারি মন্দিরে। গুপতে কহন্তি কিছি
দেবতার ঘরে ॥
শুনহে মুরারি তুম্ভে মোহর বচন। তুম্ভে মোর প্রাণপ্রিয়
কহি এ কারণ ॥
কহিবি উত্তম কথা শুন সাবধানে। যেহে মোর হিতউপদেশ
ঘেন মনে ॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু ত্রিজগতের ধন্য। তা তহুঁ অধিক প্রিয়
নাহি মোর আন ॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর অংশ জগতরগুরু। যেইছে আপনা হিত তারে
সেবা করু ॥
জগতর হিতকারী বইষ্ণব রাজা। পরম ভক্তিরে করি তারে
কর পূজা ॥
তার দেহে পূজা কলে বিষ্ণু পূজা পাএ ॥ নির্ণএ কহিলি
তোতে করএ উপাএ ॥
(মাধব—৫।১৩-২০)

*   *   *

প্রবোধ বচন বলি তুষিল তাহারে। মুরারি গুপ্তের ঘরে
গেলা সন্ধ্যাকালে ॥
হরিদাস সঙ্গে করি, মুরারি-মন্দিরে। নিভৃতে কহয়ে তারে
দেবতার ঘরে ॥
শুনহ মুরারি তুমি আমার বচন। মোর প্রিয়-প্রাণ তুমি—
কহি তে-কারণ ॥

কহিব উত্তম কথা, শুন সাবধানে। উপদেশ কহি—তোর
হিতের কারণে ॥
অদ্বৈত আচার্য্য ত্রিজগতে ধন্য। তারাধিক বন্ধু মোর নাহি
আর অন্য ॥
আপনে ঈশ্বর-অংশ—অখিলের গুরু। যে চাহে আপনা
হিত-তার সেবা করু ॥
জগতের হিত সেই বৈষ্ণবের রাজা। পরম ভকতি করি করু
তার পূজা ॥
তার দেহে পূজা পাইলে কৃষ্ণপূজা পায়। নিভৃতে কহিল
তারে—রাখিবে হিয়ায় ॥
(লোচন—২।১২।৫২-৫৯)

(গ) সন্ন্যাস দেবার প্রাক্কালে কেশব ভারতীর বক্তব্য ঃ

ভারতী কহন্তি শুন আহে বিশ্বম্ভর। তোতে দীক্ষা দেবাকু
মোঁ কম্পই অন্তর ॥
এমন্ত সুন্দর তনু সুন্দর বয়স। জনম কালরু তু ন জানু
দুঃখলেশ ॥
অপত্য সন্ততি কিছি ন হোইছি তোর। সন্ন্যাস দীক্ষা দেবাকু
অনুচিত মোর ॥
পঞ্চাশ বরষ অন্তে ইন্দ্রিয় নিবৃত্তি। তেবে সন্ন্যাস দেবাকু
কাহে শাস্ত্রনীতি ॥
এ বচন শুনি প্রভু কহে মন্দবাণী। তুম্ভর ছামুরে মুঁ কি
কহিবি জানি ॥
মায়া ন করহ মোরে সন্ন্যাসী রতন। তুম্ভ বিনু ধর্ম্মাধর্ম্ম
জানে কোন জন ॥
সংসারে দুর্লভ এহু মনুষ্য জনম। তাঁহিরে দুর্লভ কৃষ্ণভক্তি
সর্ব্বোত্তম ॥
তাঁহিরে দুর্লভ ভক্ত জনঙ্কর সঙ্গ। মনুষ দেহ হুঅই দণ্ড
কার ভঙ্গ ॥
বিলম্ব করন্তে এহু দেহ যিব যেবে। তেবে ভক্তগণ সঙ্গ
পাইব এ কেবে ॥

মায়া ন করি মোহরে করাঅ সন্ন্যাস। তুম্ভ পরসাদে হোবি
· কৃষ্ণের মনু দাস ॥
মাধব—৭।১০-১৯)

*   *   *

ভারতী কহয়ে—শুন শুন বিশ্বম্ভর। তোমারে সন্ন্যাস দিতে
কাঁপয়ে অন্তর ॥

এহেন সুন্দরতনু—তরুণ বয়স। জনম অবধি নাহি জান
দুঃখ-ক্লেশ ॥

অপত্য সন্ততি নাহি হয়ে ত তোমার। তোমারে সন্ন্যাস দিতে
না হয় আমার ॥

পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ্ব হইলে রাগের নিবৃত্তি। তবে সে সন্ন্যাস
দিতে তোরে হয় যুক্তি ॥

এ বোল শুনিঞা প্রভু কহে লহু-বাণী। তোমার সাক্ষাতে
আমি কি বলিতে জানি ॥

মায়া ন করিহ মোরে শুন ন্যাসীমুনি। ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব কেবা
জানে তোমা বিনি ॥

সংসারে দুর্ল্লভ এই মানুষের জন্ম। তাহাতে দুর্ল্লভ
কৃষ্ণভক্তি পরধর্ম্ম ॥

বড়ই দুর্ল্লভ তাহে ভক্তজন-সঙ্গ। মানুষের এ দেহ তিলেকে
হয় ভঙ্গ ॥

বিলম্ব করিতে এই দেহ যায় যবে। তবে আর বৈষ্ণবের সঙ্গ
হবে কবে ॥

মায়া না করিহ মোরে করাহ সন্ন্যাস। তোর পরসাদে মুঞি
হঙ্ কৃষ্ণদাস ॥
(লোচন—২।১৩।৫৮-৬৭)

তুলনামূলক বিচার করে দেখার জন্যে মাত্র আর একটি ক্ষেত্র থেকে উদাহরণ দোব। বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাসগ্রহণ পর্ব সমাপ্ত হয়েছে, এই সংবাদ বহন করে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেছেন চন্দ্রশেখর আচার্য। এই সংবাদ শোনার পর মাতা শচীদেবীর যে প্রতিক্রিয়া মাধব বর্ণনা করলেন, তা হোল—

কেঁউ সন্ন্যাসী ছার এতে দারুণ। গোরাকু মন্ত্র দেলা নাহি
কারুণ্য রে ॥

সুন্দর চিকুর ন দেখিলা বর্ণ। কেঁউ ছার নাপিত কলা
মুণ্ডণ রে ॥
এড়ে পাপিষ্ঠ কে সে দেলা ক্ষুর। কেমন্তে জিঁউথিলা এড়ে
নিষ্ঠুর রে ॥
মোর নিমাই ভিক্ষা কলা কা ঘরে। কি দিশুঅছি দণ্ড
করিণ করে রে ॥
(৯।৩—৬)

[সন্ন্যাসীর আহার্য গ্রহণকে 'ভিক্ষা' বলা হয়]

*　　　　*　　　　*　　　　*

কোন ছার সন্ন্যাসী সে হৃদয় দারুণ। বিশ্বম্ভরে মন্ত্র দিতে
না হৈল করুণ ॥
সে হেন সুন্দর কেশ-লাবণ্য দেখিয়া। কোন্ ছার নাপিত সে
নিদারুণ হিয়া ॥
কেমন পাপিষ্ঠ তেন কেশে দিল খুর। কেমনে বা জিল সে
নিদয়া নিঠুর ॥
আমার নিমাই কার ঘরে ভিক্ষা কৈল। মস্তক মুড়াঞা বাছা
কেমন বা হৈল ॥
(লোচন—২।১৪।৭-১০)

একাদিক্রমে আটদশ ছত্র বা তারও বেশি রচনা মাধবের থেকে লোচনে অনুবাদিত হয়ে এসেছে বলে লোচনের চৈতন্যমঙ্গলখানির মূল্য হানি ঘটেছে, এমন ইঙ্গিত মাত্রও দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। কবিরাজ গোস্বামী তো কবি কর্ণপুরের নাটক থেকে শ্রীচৈতন্য ও রায় রামানন্দের প্রশ্নোত্তর অংশগুলি আক্ষরিক অনুবাদেই গ্রহণ করেছেন কিন্তু তাই বলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানির মূল্যহানি ঘটেছে, একথা বলার স্পর্ধা কেউই দেখান নি, তা একান্তই অসঙ্গত বলে। লোচন রচনা করেছেন শ্রীচৈতন্যের অনেকখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনেতিহাস ; অপরপক্ষে মাধবের উপজীব্য বিষয় ছিল শুধুমাত্র বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস গ্রহণ। শ্রীচৈতন্য নীলাচলে এলেন। মাধব এর উল্লেখ করলেন কিন্তু আগমন-পথের বর্ণনা দিলেন না। দিলেন না এই কারণে যে গদাধর পণ্ডিত মাধবকে তা শোনান নি। কিন্তু পুরীতে পৌঁছেই শ্রীচৈতন্য সার্বভৌমের কাছে গিয়েছেন, জনৈক

সঙ্গীপ্রার্থনা করেছেন—যাতে তাঁর শ্রীজগন্নাথদর্শন সম্পূর্ণতা পায়, এ সব বহু-কথিত ঘটনা মাধবও শুনিয়েছেন। তিনি সর্বজ্ঞাত সেই তথ্যও পরিবেশন করেছেন যে সার্বভৌম তাঁর পুত্রকেই সঙ্গী হিসেবে দিয়েছিলেন আর দেবদর্শন সেরে তাঁদের ফেরার আগেই মহাপ্রসাদ আনিয়েছিলেন সকলের জন্যে।

মাধব তাঁর রচনা যে গীতোদ্দেশ্যেই লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, এর স্বীকৃতি তাঁর কাব্যের মধ্যেই আছে। তিনি বলেছেন—

তুম্ভর চরিত কিছি বর্ণিবি মু গীতে।
প্রসন্ন হোইবা মহাপ্রভু মোর চিতে যে ॥ (৮)

যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মাধব তাঁর 'চৈতন্যবিলাস' রচনা করেছিলেন, তারই দিকে লক্ষ্য রেখে অসমমাত্রিক বহু স্তবক তিনি রচনা করেছেন আর বহু ছত্রের শেষে 'হে', 'যে', 'ভো সুত', 'নাগর', 'সুন্দরী', 'গৌরাঙ্গ'—এমনি অনেক অতিপর্ব যোগ করেছেন। যেমন, বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস নিয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে যেতে চান, এই কথা তাঁর মুখ থেকে শোনার পর বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তি—

শিশুকালরু যাহাঙ্ক কোলে
খেলুথাঅ নানা কুতূহলে
সে সখামানঙ্কু দয়া না বসিলা
এহু কোমল হৃদি কমলে হে
সুন্দর ॥ ২০ ॥ চতুর্থ ছান্দ ॥
নদীয়ার নরনারী শিরে
বজ্র পকাই যিব হেলারে
কেতে পৌরুষ লভিব জগতে
এহি শিক্ষা কে দেলা তুম্ভকু হে
সুন্দর ॥ ২১ ॥

এই উক্তিটি মৃদু ভর্ৎসনা বলাই সঙ্গত। অনুমানে বাধা নেই, বিশ্বম্ভর এই ভর্ৎসনার যাথার্থ্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন তাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে—

গৌরাঙ্গ রসিক শিরোমণি।
করে প্রিয়াঙ্কু বেস মন জানি ॥

দেলে ললাটে সিন্দুরের বিন্দু।
দিবাকর কোলে কি অটে ইন্দু॥
চারিপাশে চন্দন লেপি দেই।
শশিপাশে উড়ুগণ শোহই॥
তথি মধ্যে কস্তুরী লেপি দেলে।
মুখ নিরোখি মহাসুখ হেলে॥
দেলে খঞ্জন নয়নে অঞ্জন।
ভুরু কামধনু গুণরঞ্জন॥ ছষ্ঠ ছান্দ॥ ৮-১৭॥

বিশ্বম্ভর গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপও করতেন না, মাতা শচীদেবী পুত্রবধূকে পুত্রের কাছে নিয়ে এলে তাকে প্রহার করতে উদ্যত হতেন, এমন বর্ণনা যে বৃন্দাবন দাস দিয়ে গেছেন, তা সকলেই জানেন। অথচ সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য যাত্রা করার পূর্বরাত্রে বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছেই ছিলেন, একথা জয়ানন্দ এবং লোচন বলেছেন। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পক্ষে অপাঠ্য গ্রন্থই শুধু নয় সেখানি 'তত্ত্ববিদ্বেষী', 'অসম্প্রদায়-রচিত অস্পৃশ্য' অতএব ঐ গ্রন্থের নাম হওয়া উচিত 'চৈতন্যামঙ্গল' (গৌড়ীয় মিশনের আচার্য সম্পাদিত 'মহাকবি শ্রীমহৎ পূজ্যপাদ লোচনদাস ঠাকুর বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যমংগল' ২য় সংস্করণ, ১৯৭৯ খ্রীঃ, ভূমিকা, পৃঃ 'ক') —এই অপবাদ দিয়ে ওটিকে বর্জন করা হয়েছে। কিন্তু লোচনও ঐ একই কাহিনী শুনিয়েছেন এবং তার উৎস যে গদাধর পণ্ডিতের মুখ থেকেই শ্রুত মাধবের চৈতন্যবিলাস' খানির বর্ণনা, এতে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকে না। জয়ানন্দকে বর্জন করলেও লোচনকে বর্জন করার প্রশ্ন অবান্তর, তাই বিষয়টিকে নিয়ে শ্রীরাধা-গোবিন্দ নাথ তাঁর 'শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভূমিকা' গ্রন্থে (সাধনা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৬) সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। (পৃঃ ১৭০-৮২)। শ্রীনাথের কয়েকটি উক্তি পাঠকদের বিচারের জন্য উদ্ধৃত করছি—

(১) 'গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে, প্রভু নিজে তো বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকটে কখনও যাইতেনই না, শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনিয়া প্রভুর নিকট কখনও বসাইলেও প্রভু তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতও

করিতেন না। বিষ্ণুপ্রিয়া যে সেখানে ছিলেন, তাহাও বোধ হয় প্রভু জানিতে পারেন নাই—এমনই অন্যানুসন্ধান-রহিত পরমাবেশ ছিল প্রভুর।' (পৃঃ ১৭১)

(২) 'লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিষ্ণুপ্রিয়া মনে করিয়াই যে প্রভু তাঁহাকে "মারিবার—প্রহার করার নিমিত্ত" উদ্যত হইতেন তাহা নহে। ভক্তভাব, অর্থাৎ দুর্জয় মানে মানবতী শ্রীশ্রীরাধার ভাবে, যখন প্রভু আবিষ্ট হইতেন, সেই অবস্থায় যখন শ্রীকৃষ্ণের নাম-পর্যন্তও শুনিতে পারিতেন না, তখন বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিলে, শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয়া কোনও দূতী মনে করিয়াই প্রভু তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্যই তাড়া করিতেন।' (পৃঃ ১৭১)

(৩) 'শ্রীবাস-ভবনে কীর্তনারম্ভ হইতে (গয়া থেকে ফেরার প্রায় এক মাস পরে) এক বৎসর প্রভু সারারাত্রিই শ্রীবাস-গৃহে কীর্তনে রত থাকিতেন, ঊষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে ফিরিতেন।' (পৃঃ ১৭৪)

(৪) 'শ্রীবাস-গৃহে কীর্তনারম্ভের পরে তো প্রভু সমগ্র রাত্রিই কীর্তনে থাকিতেন। সেই সময় রাত্রিতে স্বগৃহে শয়নের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। মুরারি গুপ্ত এবং কবি কর্ণপূরের কথিত গদাধরের সহিত প্রভুর স্বগৃহে শয়ন, কেবল কীর্তনারম্ভের পূর্ববর্তী কিঞ্চিন্ন্যূন একমাসের মধ্যেই সম্ভব।' (পৃঃ ১৭৫)

(৫) 'যে-রাত্রির চারিদণ্ড থাকিতে সন্ন্যাস-গ্রহণার্থ প্রভু গৃহত্যাগ করেন, সেই রাত্রিতে কীর্তনার্থ প্রভু শ্রীবাসভবনে যায়েন নাই, নিজ গৃহেই ছিলেন। ......শ্রীধর একটি লাউ লইয়া আসিয়াছিলেন। আর একজন দুগ্ধ লইয়া আসিলেন। প্রভু জননীকে বলিলেন—"দুগ্ধ-লাউ পাক গিয়া করহ সকাল। সন্তোষে চলিলা শচী করিতে রন্ধন। চৈ. ভা. ২।২৬।৮৭-৮৮ ॥" শচীমাতাই রন্ধন করিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, সে-দিন বিষ্ণুপ্রিয়া শচীগৃহে ছিলেন না, থাকিলে তিনিই রন্ধন করিতেন।"

(পৃঃ ১৭৭)

(৬) 'শ্রীল লোচন দাস তাঁহার গ্রন্থে, মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের রাত্রিতে প্রভুর শয়নগৃহে, গৌর ও বিষ্ণুপ্রিয়ার একত্রাবস্থিতির এবং উভয়ের মধ্যে বহু রঙ্গ-রসের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু

লোচনদাস উল্লিখিত বিবরণের উপাদান কোথায় পাইলেন, তাহা তিনি বলেন নাই। (পৃঃ ১৭৮)

(৭) 'লোচনদাস যে তাঁহার শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে গৌর-নাগরীবাদ নামক একটি নূতন মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সর্বজনবিদিত। তাঁহার এই নূতন মতবাদের সমর্থনেই যে তিনি প্রভুর গৃহত্যাগের রাত্রিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত প্রভুর অবাস্তব রঙ্গ-রহস্যের কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।' (পৃঃ ১৮০)

উদ্ধৃত অংশগুলি বিচার করে দেখলে, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি বিশ্বম্ভরের আচরণ কেউই সমর্থনযোগ্য মনে করবেন না। বিশ্বম্ভর যে সন্ন্যাস নেবেন এতথ্য সকলের আগে জানতে পারেন শ্রীনিত্যানন্দ, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য, মুকুন্দ আর শচীদেবী। চৈতন্যভাগবতে এর উল্লেখ (২।২৬।৬০) আছে। আর গদাধর পণ্ডিত সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বরাত্রির বিবরণ যদি মাধবকে না শুনিয়ে থাকতেন তাহলে মাধবের পক্ষে এসব লেখার কোন সুযোগই যে ছিল না, এটি সহজবোধ্য। শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ লোচনের বিরুদ্ধে শুধু 'গৌরনাগরীবাদ' প্রচারের অভিযোগই করেননি, তিনি একটি অসত্য কাহিনীর অবতারণা করেছেন—একথাও বলেছেন। লোচন পূর্বসূরীদের, বিশেষ করে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। তবু বৃন্দাবন যা বলেন নি, সেকথা বলার সৎসাহস যখন দেখিয়েছেন তখন কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে নিঃসন্দেহ হবার পরই যে তা করেছেন, এটি কষ্টসাধ্য অনুমান নয়। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বরাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বম্ভর গৃহে ছিলেন না, এর প্রমাণ হোল শচীদেবীকে রান্না করতে হয়েছিল। যুবতী পত্নীকে পরিত্যাগ করে পুত্র সন্ন্যাস নিতে চলেছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার গভীর মর্মবেদনা স্নেহশীলা শচীদেবী অন্তরে অনুভব করেই স্বয়ং রান্না করতে গিয়েছিলেন—এই চিন্তাই কি উপযুক্ত নয়? তাছাড়া পরদিন যে পুত্র সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাকে তার প্রিয় খাদ্যবস্তু রন্ধন করে খাওয়ানোর জন্য মাতার ব্যাকুলতার দিকটিও বিচার্য।

পূর্বরাত্রে শয়নগৃহে বিষ্ণুপ্রিয়াকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বিশ্বম্ভর উপস্থিত ছিলেন, এতে তাঁর মহিমা ক্ষুণ্ণ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

এর আগেই তিনি শচীদেবীকে নিজের সন্ন্যাসগ্রহণের সপক্ষে বহু কথা বলে তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্ষেত্রে এই আচরণ প্রেমধর্মের প্রবক্তা বিশ্বম্ভরের গৌরব বৃদ্ধিই করেছে, হ্রাস করেনি। আর লোচনদাস তাঁর কাহিনীর উৎস নির্দেশ না করলেও, আমাদের কাছে সে উৎসের সন্ধান উপস্থিত হয়েছে। একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণবাচার্যকে অলীক বিষয়ের প্রচারক হিসেবে চিহ্নিত করা কখনোই শোভন নয়। শ্রীযুক্ত নাথ যে সব কথা বলেছেন, একালের পাঠকদের কাছে তা কতোখানি গ্রহণযোগ্য হবে, তা তাঁরাই বিচার করবেন।

মাধব রচিত দুখানি 'চৈতন্য বিলাস' পুঁথি এখনও ওড়িষ্যা রাজ্য প্রদর্শশালায় রক্ষিত আছে। তার প্রামাণিকতা কোন প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু "কহই মাধব রথ"—শুধু আমাকে নয়, সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত পুঁথিশালার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পণ্ডিত নীলমণি মিশ্রকেও অনেক ভাবিয়েছে। মাধব পট্টনায়ক রচিত তখনও কোন পুঁথি পাওয়া যায়নি তাই 'রথ' সমস্যার সমাধানও সম্ভব হয়নি।

॥ ৩ ॥

প্রায় সাত-আট বছর আগে পণ্ডিত মিশ্র আমাকে জানান যে মাধব পট্টনায়ক রচিত পুঁথি কোন এক গবেষক খুঁজে পেয়েছেন। গবেষক কোন পুঁথি পেলে তা সরকারী পুঁথিশালায় দেন না তাই পুঁথিটি সম্পর্কে আমাদের উভয়ের অনুসন্ধিৎসা অপূর্ণই থাকে। পণ্ডিত সদাশিব রথ শর্মার 'চৈতন্য চকড়া' একখণ্ড সংগ্রহ করে পণ্ডিত নীলমণি মিশ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন সেখানে বহরমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওড়িয়া বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ড. কাহ্নুচরণ মিশ্রও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা 'চৈতন্যচকড়া' গ্রন্থখানি খুলে দেখার কৌতূহলটুকুও দেখালেন না বরং আমাকে শোনালেন, মাধব পট্টনায়কের একাধিক পুঁথি মিলেছে এবং অবিলম্বে শ্রীচৈতন্য সম্পর্কিত বহু ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটবে।

এই পুঁথিগুলির সম্পাদক ড. ঘনশ্যাম রথ ও ড. বৃন্দাবনচন্দ্র আচার্য সম্বলপুর থেকে (প্রদীপ পাব্‌লিকেশনস্‌, আনন্দ, ব্রুকস্‌ হিল, সম্বলপুর) এই ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থখানি সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। প্রথম সম্পাদক তাঁর পুঁথি পরিচিতিটি লিখেছিলেন ১৯১৪ সালের বারোই অক্টোবর। বইটি বাজারে এসেছে (মূল্য ২০ টাকা) অতি সম্প্রতি। পুস্তক প্রকাশের অহেতুক বিলম্ব সম্পর্কে প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থরচয়িতার তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকে, বিশেষ করে তা যদি ওড়িষ্যায় রচিত হয় তাহলে সে গ্রন্থ প্রকাশের সমস্যা বহুবিধ। এক কটক এবং ভুবনেশ্বর ছাড়া বড় বই ছাপবার মতো প্রেস অন্যত্র নেই। ছোট বই হলেও প্রেসগুলি বইর চাইতে অন্যান্য ছোট ছোট কাজ করতেই বেশি আগ্রহী। আর ছোট প্রেসগুলি চার পৃষ্ঠা করে ছেপে বই বার করতে বড় বেশি সময় নেয়। ড. রথ ও আচার্যের পুস্তকগুলির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র একশ' আঠারো—ভূমিকা ৩৮ পৃষ্ঠা আর পাঠভেদ, টীকা-ব্যাখ্যা সহ মূল রচনা ৮০ পৃষ্ঠা। এই ছোট বইটি প্রকাশে যদি চার বছর অতিবাহিত হয়ে থাকে তাহলে তা যে যথেষ্ট দীর্ঘ তাতে সন্দেহ নেই। একেবারে না হওয়ার চাইতে বিলম্বে হওয়াও ভালো—এই প্রবাদবাক্য মনে রেখে বইখানির প্রকাশনাকে আমি সাদর সম্বর্ধনা জানিয়েছি। মাধব পট্টনায়কের পুঁথি ওঁরা পেয়েছেন, ছেপেছেন, এর জন্য গবেষকরা তাঁদের কাছে ঋণী থাকবেন।

ড. রথ মাধব পট্টনায়কের তিনখানি পুঁথি পেয়েছেন আর সেগুলির মধ্যে গুরুতর পাঠভেদ দেখা যায়নি, এটি প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য বিষয়। একাধিক পুঁথির সহায়তা গ্রহণ করে মূলপাঠ স্থির করতে পারলে, সেই সম্পাদিত গ্রন্থকে আমরা নির্ভরযোগ্য মনে করি। তিনি ১৯০৪ সালে খণ্ডপাড়া নামক (জেলা-পুরী) একটি গ্রামে ৫১টি পত্রবিশিষ্ট একটি পুঁথি পান। প্রতিপত্রে পাঁচ ছত্র করে লেখা কিন্তু পুঁথিটি বেশ প্রাচীন বলেই কিছু কিছু অংশ বিনষ্ট হয়েছে। ১৯০৮ সালে তিনি গঞ্জাম জেলার ঘুমুসর মহকুমার 'বেলগুণ্ঠা' গ্রাম থেকে ২৬টি পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পুঁথিখানি পান। এখানির প্রতিপৃষ্ঠার ছত্রসংখ্যা ছয়, কিছু ক্ষেত্রে সাত। ১৯০০ সালের গ্রীষ্মাবকাশে ড. রথ পুরীজেলার নয়াগড় নিকটবর্তী

মালিসাহির 'মৃত্যুঞ্জয়-শাসন'—(শাসন=ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত গ্রাম) নিবাসী শ্রীখগেশ্বর মিশ্রের কাছ থেকে তৃতীয় একখানি পুঁথি পান। এটির পত্রসংখ্যা ৬৭ এবং প্রতিপত্রে ছত্রসংখ্যা চার। পুঁথিটির অনুলিপি প্রস্তুতকারক কৌশিক-গোত্রের শ্রীকণ্ঠ দাস। পুঁথির সমাপ্তি অংশে আছে—

বারতা অছই বিশেষ।
লেখনকারের ন ধরিব দোষ॥

সম্পাদকদ্বয় বলেছেন যে 'বারতা' শব্দের অর্থ মৃত্যু সংবাদ*। ওড়িষ্যার প্রখ্যাত 'কবিসম্রাট' উপেন্দ্র ভঞ্জের (১৬৭০-১৭২০) রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'বৈদেহীশ-বিলাস' কাব্যখানিতে মারীচের প্রতি রাবণের উক্তি—

'বার্তাবন্ধু হোই না দেলু কি পাঁই শোচ হেবাকু'—এখানে 'বার্তাবন্ধু' হলেন অত্যন্ত নিকট আত্মীয়, যাঁর কাছে পারিবারিক মৃত্যুসংবাদ দ্রুতগতিতে পৌঁছে দেওয়া কর্তব্য। সম্পাদকেরা জানিয়েছেন যে পুঁথিগুলি ওড়িষ্যার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. নবীন কিশোর সাহু ও সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রয়াত অধ্যক্ষ ড. শরৎচন্দ্র বেহেরা দেখেছিলেন এবং পুঁথিগুলির প্রামাণিকতা আর সেই সঙ্গে প্রাচীনতা স্বীকার করে নিয়ে এগুলির সম্পাদনায় উৎসাহিতও করেছিলেন। ভূমিকা থেকে জানা যায়, এঁরা একই প্রকার উৎসাহ ড. কুঞ্জবিহারী ত্রিপাঠী, ড. কুঞ্জবিহারী দাস এবং ড. কাহ্নুচরণ মিশ্রের কাছ থেকেও পেয়েছেন। বলা বাহুল্য এঁরা সকলেই অবসরপ্রাপ্ত খ্যাতিমান অধ্যাপক ও গবেষক। এঁদের কেউই পুঁথিগুলি খুঁটিয়ে না দেখে সম্পাদনার জন্য উৎসাহ দেবার মানুষ নন। তাই তিনখানি পুঁথির সাহায্যে গড়ে তোলা মাধব পট্টনায়ক রচিত 'বৈষ্ণব লীলামৃত' খানির বিষয়বস্তু বঙ্গীয় পাঠক সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরা আমার কর্তব্য বলে মনে করেছি।

'বৈষ্ণব লীলামৃত' রচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনার পূর্বেই উল্লেখ করি যে এই মাধব পট্টনায়ক যে 'চৈতন্যবিলাস'

* মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণের উক্তি—'নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা, রে দূত!' এখানেও কিন্তু 'বারতা' শব্দে মৃত্যুসংবাদ ব্যঞ্জিত।

রচনা করেছিলেন, তার স্বীকৃতি এই পুঁথিগুলির মধ্যে আছে। তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন—

রচিলি চৈতন্যবিলাস। প্রভুর সন্ন্যাস যে রস ॥
রাজার অংক চউবিংশে। রচিলি চৈতন্যবিলাসে ॥
এবকু অংক অঠচালিশ[২]। লিহিবি বৈষ্ণবলীলা রস।

(প্রথম অধ্যায়, ৭১-৭৩)

[১। ১৫১৬ খ্রীঃ, ২। ১৫৩৫ খ্রীঃ]

বালাবাহুল্য, যে রাজার কথা কবি এখানে উল্লেখ করেছেন, তিনি হলেন গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব, যাঁর শাসনকাল ১৪৯৭ থেকে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাজবংশের 'অংক' গণনার একটি বিশিষ্ট রীতি আছে। সেই রীতিতে ১ বাদ যায়, বাদ যায় ৬ আর ৬ যুক্ত সমস্ত সংখ্যা, ১০ ছাড়া শূন্যযুক্ত সমস্ত সংখ্যা। সেই রীতি অনুসারেই 'অঙ্কের' সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ করা হোল। পরবর্তীকালে গ্রন্থের যেখানেই 'অঙ্কের' উল্লেখ থাকবে, সেখানেই আমরা বন্ধনীর মধ্যে খ্রীষ্টাব্দ উল্লেখ করবো। আপাতত 'রথ' উপাধির সমাধান ঘটল এবং বিশিষ্ট চৈতন্যভক্ত ওড়িয়া কবি মাধব পট্টনায়কের পূর্ণ পরিচয়ও পাওয়া গেল। 'রথ' লিপিকর প্রমাদ এবং সম্ভবত 'মাধব দাস' লিখতে গিয়ে লিপিকর 'রথ' লিখেছেন। এ ধরনের প্রমাদ যে অনুলিখিত পুঁথিগুলিতে যে অজস্র দেখা যায়, সে কথা সর্বস্বীকৃত। এবার আমরা প্রথমে মাধব পট্টনায়কের পরিচয়টি পাঠকদের অবগতির জন্য তুলে ধরব। তারপর ন'টি অধ্যায়ের অধ্যায়ক্রমিক আলোচনা—অর্থাৎ সেই অধ্যায়গুলির মধ্যে কবি কোন্ কোন্ তথ্যের অবতারণা করেছেন তার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ তুলে ধরবো।

॥ ৪ ॥

মাধব তাঁর পরিচয় এবং জীবনের অল্প কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা কাব্যখানির মধ্যেই বর্ণনা করেছেন তবু এই বিষয়গুলিকে প্রথমেই একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে তুলে ধরার একমাত্র উদ্দেশ্য, কবি সম্পর্কে

কিছু ধারণা সৃজন। মাধব পট্টনায়ক 'বৈষ্ণব বন্দনায়' স্থান পেয়েছেন। তিনি উৎকলবাসী প্রসিদ্ধ গৌরভক্তভাবেই চিহ্নিত। তাছাড়া তিনি রায় রামানন্দের সর্বক্ষণের সহচর ছিলেন তিন দশকেরও বেশি। অথচ শুধু নামটি ছাড়া তাঁর সম্পর্কে আমরা এর আগে কোন তথ্যই পাইনি। মধ্যযুগীয় কাব্যগুলিতে প্রণেতারা তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় ও বহুসংশ্লিষ্ট তথ্য রেখে যেতেন। আমরা যখন 'চৈতন্যবিলাস' দেখি তখন শুধু নাম ছাড়া সেখানে অন্য কিছুই পাইনি। অবশ্য এরকম ঘটনা সেইসব ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যেখানে কবি একাধিক কাব্য রচনা করেছেন আর সেগুলির কোন একটিতে আত্মজীবনীমূলক উপাদান তুলে ধরেছেন। মাত্র এইসব ক্ষেত্রে অন্য রচনাগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে তাঁর নীরবতা লক্ষ্য করা যায়। আবার এ কথাও ঠিক নয় যে ঐসব যুগের কবিরা তাঁদের প্রথম রচনাতেই ব্যক্তিগত পরিচয় তুলে ধরতেন। এমনও দেখা গেছে পূর্ববর্তী রচনায় ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থেকে কবি পরবর্তী রচনায় নিজের সম্পর্কে কিছু তথ্য রেখে গেছেন। আলোচ্য রচনাখানি সেই পর্যায়ভুক্ত। 'চৈতন্যবিলাস' রচনা করেছেন ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ যখন থেকে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে প্রায় স্থায়ী-ভাবে বসবাস শুরু করেন। তাতে মাধব নিজের পরিচয় দেননি। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব ঘটে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। তার প্রায় দু'বছর পরে মাধব 'বৈষ্ণব লীলামৃত' রচনা করেন অর্থাৎ চৈতন্যবিলাস প্রায় উনিশ বছর পরে। এই গ্রন্থই মনে হয় তাঁর শেষ রচনা এবং এটিতেই তিনি তাঁর জীবনী সম্পর্কে অল্প কিছু তথ্য অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বর্ণনা করে গেছেন।

মাধব পট্টনায়ক রামানন্দের কাছে আশ্রয় নেবার পর তিনিই এঁর শিক্ষাদীক্ষার ভার নেন। মাধব তাঁরই পুঁথি লেখার রীতি শেখেন আর বৈষ্ণবজনোচিত আচার-ব্যবহারও শেখেন। মাধব গদাধর পণ্ডিতের কাছেই দীক্ষা নেন। রামানন্দের সর্বক্ষণের সঙ্গী হওয়ার ফলে মাধব একই কালে ওড়িষ্যার ও গৌড়ের বৈষ্ণবদের সান্নিধ্যও পেয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গে দীর্ঘকালীন সংসর্গের ফলে সাধুসঙ্গ-জনিত ফলোদয় যে তাঁর জীবনে ঘটেছিল, তা মাধবের বিষয়-বর্ণনার ভঙ্গী আর রচনাগুলির ভাষা থেকেই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

বৈষ্ণবসুলভ দীনতা, শ্রদ্ধেয়দের প্রতি অসীম ভক্তি, সহিষ্ণুতা, সত্যনিষ্ঠা এবং নির্বিচারে প্রতিটি মানুষের সম্পর্কে উদারতা— তাঁর কাব্যখানির ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। আমরা সমগ্র ওড়িয়া রচনাটি বঙ্গাক্ষরে তুলে ধরলে, পাঠকদের পক্ষে আমাদের মূল্যায়ন যে কতোখানি বস্তুনিষ্ঠ তা অবশ্যই স্বীকার্য হয়ে উঠতো। কিন্তু সেক্ষেত্রে টীকা ব্যাখ্যাও প্রয়োজন হোত—বক্তব্যটি বোধগম্য করে তোলার জন্যে। আমরা তা থেকে বিরত থেকে একসঙ্গে কিছু কিছু শ্লোকের বর্ণনীয় বিষয়গুলি এই রচনায় তুলে ধরছি। অবশ্য যে বক্তব্যগুলি ঐতিহাসিক কারণে মূল্যবান, সেগুলি কবির ভাষাতেই উদ্ধৃত করে, পরে তার ভাবার্থ দিলাম। এতে অন্তত এটিই প্রমাণিত হবে যে, কবির বক্তব্যের মধ্যে আমরা কোথাও আমাদের ব্যক্তিগত অভিমত মিশিয়ে দেবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিনি। ন'টি অধ্যায়ে মাধব যা কিছু বলেছেন, ক্রমপর্যায়ে সেই বিবরণগুলি তুলে ধরার পর শেষ একটি অধ্যায়ে আমরা কিছু অভিমত নিবেদন করেছি মাত্র। আশা কবি এটুকু স্বাধীনতা গ্রহণের অধিকার আমাদের আছে।

আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কবির উক্তি—

মু দীন মাধব পামর। ক্ষুদ্র কুলরে জন্ম মোর ॥
মো পিতা নাম ভগবান। মাতা মো হীরা দেবী জান ॥
করণ বংশে জন্ম হোই। পট্টনায়ক সংজ্ঞা বহি ॥
খণ্ডপাড়া মো জন্ম স্থান। শ্রীক্ষেত্রবাসে দেলি মন ॥

মাত্র ২১ বছর বয়সে পিতৃমাতৃহীন যুবক অত্যন্ত আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং খুবই অসহায় বোধ করেন। তিনি স্থির করেন শ্রীক্ষেত্রে যদি চলে আসেন তাহলে অন্তত অনাহারে তাঁকে কষ্ট পেতে হবে না, একটা আশ্রয় জুটে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

তিনি খণ্ডপাড়া থেকে পুরীর পথে যাবার সময় প্রথম দিনই বেণ্টপুর গ্রামের কাছে সন্ধ্যা হয়ে যায়। শুধুমাত্র রাত্রিবাসের উদ্দেশ্যে পথশ্রান্ত যুবক বেণ্টপুরের সম্পন্ন গৃহস্থ ভবানন্দ পট্টনায়কের দ্বারস্থ হন। পুরী থেকে আলালনাথ প্রায় বিশ কিলো-মিটার দূরে, পশ্চিম দিকে। আলালনাথ তীর্থে যাবার দক্ষিণ

পাশেই বেণ্টপুর গ্রামটি অবস্থিত। আলালনাথে চতুর্ভুজ জনার্দন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখানে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের 'সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবতের' চিহ্ন দেখা যায়—অন্তত ঐ রকমের একটি আভাস বা অস্পষ্ট সাদৃশ্য এখনও দেখা যায়। বেণ্টপুরের ভবানন্দ পট্টনায়ক রায় রামানন্দের পিতা। এঁদের আদি বাসস্থান ছিল যাজপুরের নিকটবর্তী 'রামাই আনন্দকোল' গ্রাম।

যেদিন মাধব ভবানন্দের বাড়িতে রাত্রিবাসের আশায় উপস্থিত হন, সেদিন একটি আশাতিরিক্ত যোগাযোগও তাঁর জীবনে ঘটে যায়। সেদিন ভবানন্দের গৃহে আতিথ্য নিয়েছিলেন মাধবেন্দ্র-পুরী আর তাঁর দুই শিষ্য ঈশ্বরপুরী এবং রাঘবপুরী। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা সন্ধ্যার পর নামকীর্তনে রত হন আর এই নামকীর্তন শ্রবণে মাধবের জীবনে সম্পূর্ণ নতুন ভাবোদয় ঘটে। তাঁর মনে হয়, এই সন্ন্যাসীত্রয়ের সঙ্গই তাঁর জীবনকে প্রকৃত মূল্য দিতে পারে।

পরদিন মাধবেন্দ্র যখন সশিষ্য যাবার উদ্যোগ করছিলেন, তখন মাধব তাঁর কাছে আপন মনোবাসনা ব্যক্ত করেন। অদীক্ষিত এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত এই যুবককে তিনি সঙ্গে নিতে অস্বীকার করেন। তিনি কিন্তু মাধবকে ভবানন্দেরই আশ্রয়ে থাকার পরামর্শ দিয়ে যান। ভবানন্দ যখন জানলেন যে মাধব প্রকৃতপক্ষে শ্রীক্ষেত্রে থাকার জন্যেই নিঃসম্বল অবস্থায় খণ্ডপাড়া ত্যাগ করে চলে এসেছেন, তখন তিনি তাঁকে আপন নীলাচলবাসী পুত্র রামানন্দের কাছেই প্রেরণ করেন। মাধবের পরম সৌভাগ্য, রামানন্দ তাঁকে নিরাশ তো করলেনই না, অধিকন্তু তাঁকে কাছে রেখে কিছু কিছু শিক্ষাদানের ভারও গ্রহণ করলেন। এর অল্প কিছুদিন পরে রামানন্দ তাঁর 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটকটির রচনা সমাপ্ত করেন। এটি ১৫০২ সালের ঘটনা। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান প্রণেতা শ্রীহরিদাস দাস অনুমান করেছেন নাটকটি ১৪২৬-৩২ শকের মধ্যে রচিত। (পৃঃ ১৫৬৮)। এই অনুমানের কারণ, রামানন্দের রচনায় শ্রীগৌরাঙ্গের কোন উল্লেখ নেই। অভিধান প্রণেতার মতে ১৪৩২ শকে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেই পথে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে রামানন্দের সাক্ষাৎ এবং প্রেম-

ভক্তিবাদ নিয়ে বহু আলোচনা হয়। যেহেতু নাটকে শ্রীচৈতন্য অনুপস্থিত, এটি ১৪৩২ শকের পূর্বে কোন এক সময় রচিত হয়েছিল। মাধব কিন্তু রচনা সমাপ্তি এবং নাটকটি গজপতি প্রতাপ রুদ্রের হাতে তুলে দেবার খ্রীষ্টাব্দ উল্লেখ করেছেন ১৫০২ বলেই। শকাব্দের হিসেবে হয় ১৪২৪। যাই হোক, রাজা নাটকটি পাঠ করে বিমোহিত হন এবং রামানন্দকে 'রায়' উপাধিসহ স্বর্ণ-নির্মিত একটি যষ্টি উপহার দেন। রাজা নাটকটির শ্রীমন্দিরে অভিনয়েরও আদেশ দেন। মাধব লিখেছেন, জগন্নাথ বল্লভ নাটক শ্রীমন্দিরে বহুবার অভিনীত হয়েছিল।

মাধবের উল্লেখ অনুযায়ী ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে রায় রামানন্দকে গজপতি রাজমহেন্দ্রীর শাসনভার দিয়ে পাঠান। উনি দীর্ঘকাল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করেন কিন্তু তাঁর জীবনের গতিপথে আমূল পরিবর্তন আসে ১৫১০ খৃষ্টাব্দে, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে পরিচয় এবং আলোচনার পর। কবি কর্ণপূরের মহাকাব্যখানির বর্ণনা-মতে শ্রীচৈতন্য ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দু'বার রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে রাজকার্য পরিত্যাগ করে পুরী চলে আসার জন্যে অনুরোধ করেন। অবশ্য অন্য কোন গৌরচরিতকার মহাপ্রভুর সঙ্গে রায় রামানন্দের দেখা সাক্ষাৎ যে দু'বার হয়েছিল, তা বলেন নি। বৃন্দাবন দাস তো দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ প্রসঙ্গের উল্লেখই করেননি। তবে মাধবের বক্তব্য অনুসরণে বোঝা যায় যে শ্রীচৈতন্য এবং রায় রামানন্দের প্রথমবার আলাপের পর থেকেই রায়ের রাজকার্যে অবহেলা শুরু হয়েছিল। প্রথমবারের আলোচনা মাধব শুনেছিলেন আর তার বিশদ বর্ণনাও দিয়েছেন।

১৫১২ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় যখন ওড়িষ্যা অভিযানে প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন প্রতাপরুদ্রদেব জানতে পারেন যে সৈন্যদের সুসজ্জিত করে কৃষ্ণদেবের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য রায় রামানন্দ মোটেই প্রস্তুত নন। রাজা স্বয়ং বিদ্যানগর যান আর একটু অসন্তুষ্ট হন। ধর্মাচরণের ফলে রাজ্য রক্ষার মতো কাজ অবহেলিত হচ্ছিল। তিনি অবিলম্বে রাজমেহেন্দ্রী থেকে রায়কে পুরী চলে আসার নির্দেশ দেন আর রাজকার্য থেকে

সম্পূর্ণভাবেই অব্যাহতি দেন। পরবর্তীকালে রায় শ্রীক্ষেত্রেই বৈষ্ণবগোষ্ঠীর মধ্যে পরম সাত্ত্বিক জীবনযাপন করেন এবং শ্রীচৈতন্যের সঙ্গও লাভ করেন।

মাধব দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন। কারণ তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থ থেকে আমরা এমন বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যের বিবরণ পাই, যেগুলির তিনি ছিলেন শ্রোতা বা অন্যতম প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। তিনি ২১ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন এবং পথে ভবানন্দ পট্টনায়কের গৃহে মাধবেন্দ্র পুরীর সাক্ষাৎ পান। এই মহাপুরুষ ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময় দেহরক্ষা করেন। তার পূর্বেই ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গজপতি প্রতাপ রুদ্রদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং রামানন্দ পট্টনায়ককে রাজকার্যে নিয়োজিত করেন। এ থেকে অনুমান করি মাধবের পক্ষে মাধবেন্দ্রপুরীর দর্শনলাভ ১৪৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন একসময় হয়েছিল। এই অনুমানের উপর নির্ভর করলে, মাধবের জন্ম ১৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি হয়েছিল বলেই ধরে নিতে হয়। তাহলে ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি তাঁর প্রথম পুঁথি 'চৈতন্য-বিলাস' রচনা করেন তখন তাঁর বয়স প্রায় ৩৯ বছর আর 'বৈষ্ণব লীলামৃত' রচনার সময় তাঁর বয়স ৫৮ বছর স্বীকার করতে হয়। এই সাধারণ হিসেবে তাঁকে দীর্ঘায়ুর অধিকারী যেমনি বলা যায় তেমনি বলা যায় দুটি পুঁথিই মাধবের পরিণত বয়সের রচনা।

॥ ৫ ॥

মাধব রচিত 'লীলামৃত' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টির মোট শ্লোক সংখ্যা বিরাশি। এর মধ্যে প্রথম উনত্রিশটি শ্লোক শুধু মাত্র শ্রীজগন্নাথের প্রশস্তিগানে ব্যয়িত হয়েছে। তাঁর মতে, নীলাচল 'নিত্যকৃষ্ণের' 'নিত্যধাম'। তিনি অবশ্য শুধু শ্রীজগন্নাথেরই নয়, চতুর্ধামূর্তিরই (শ্রীজগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা এবং সুদর্শন) স্তবগান করেছেন। এরপর এসেছে শ্রীচৈতন্যের প্রসঙ্গ। কিন্তু তাঁর কথা কিছু বলার আগেই বললেন,—'সে মহাতপা বৈষ্ণব। তাহাঙ্ক

লীলা কে বর্ণিব।' (৩৩), যাই হোক প্রধান বৈষ্ণবদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে মাধব নামগানের মহিমা সম্পর্কেও লিখেছেন। তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন এই জন্যে যে 'দুর্লভ এ সাধুচরিত। নীলাচলরে প্রকাশিত।' (৫১), এই কবির বৈষ্ণবজনোচিত বিনয় অননুকরণীয়। সেই বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তিনি বললেন—

বৈষ্ণবজন পদরজ। মো শিরে পড়ু অবিরত॥
মু হীন মাধব পামর। শূদ্র কুলরে জন্ম মোর॥
(৫৩-৫৪)

তিনি গদাধর পণ্ডিতকে 'গুরু' আখ্যা দিয়ে প্রথম পুঁথিতেই প্রমাণ রেখে গিয়েছেন যে তিনি তাঁর কাছেই দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এই পুঁথিতে মাধব আরও বিশদ হলেন, বললেন—

গুরু পণ্ডিত গদাধর। দয়া সে কলেক অপার॥
গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা দেলে। মূঢ় জীবকু নিস্তারিলে॥
মু অটে গদাধর শিষ্য। ভগত জনে মো বিশ্বাস॥
শ্রীগুরু পাদ নিত্য সেবি। লভিলি জ্ঞান ভক্তি অর্পি॥
বৈষ্ণবসেবা মূল কলি। বৈষ্ণবপাদে চিত্ত দেলি॥
মূল মো বৈষ্ণব সঙ্গ। বর্ণিবি বৈষ্ণব প্রসঙ্গ॥
গোপীভাবরে ভক্তি যার। করও হৃদে সেহু হার॥
(৫৮-৬৪)

অর্থাৎ, গদাধর পণ্ডিত আমার গুরু এবং ভবসমুদ্র থেকে আমাকে উত্তীর্ণ করে দেবার দায়িত্ব পালন করার জন্যে তিনি আমার মত মূঢ় ব্যক্তিকে (দশাক্ষর) গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। আমি শ্রীগদাধরেরই শিষ্য এবং প্রত্যহ তাঁর শ্রীপাদপদ্ম সেবা করেই যা কিছু জ্ঞান অর্জন করেছি। পরিবর্তে গুরুকে যা দিয়েছি তা হোল শুধুই ভক্তি। যাঁরা (কৃষ্ণ) ভক্ত, তাঁদের প্রতি আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং তাঁদের, অর্থাৎ বৈষ্ণবদের সেবাই আমি আমার মূল কর্তব্য মনে করেছি। বৈষ্ণব সঙ্গলাভে আমি ধন্য এবং এখন আমার উদ্দেশ্য বৈষ্ণব প্রসঙ্গেরই বর্ণনা। যাঁরা গোপীভাবে কৃষ্ণে ভক্তি অর্পণ করতে চান তাঁরা ঐ ভক্তিকেই আশ্রয় করুন।

কৃতজ্ঞতা একটি মহৎ গুণ। মাধব সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানালেন—

বৈষ্ণব রায় রামানন্দ। সুজান সুজ্ঞান পণ্ডিত ॥
রাম রায় যে অন্নদাতা। ভগতি রসতত্ত্ব বেত্তা ॥ (৬৭-৬৮)

শ্লোক ৭১ থেকে ৭৩ এ দু'টিতে গ্রন্থ রচনার সাল উল্লিখিত হয়েছে, গ্রন্থগুলির নামসহ। এই তিনটি শ্লোক এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষাংশে উদ্ধৃত হয়েছে। কবির প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকগুলিতে বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, অচ্যুতানন্দ দাস, অনন্ত দাস ও যশোবন্ত দাস—এই 'পঞ্চসখার' গুণকীর্তন করেছেন, শ্রদ্ধা জানিয়েছেন শ্রীজীবদেবাচার্য এবং রাজ্য পরিচালনায় সুদক্ষ নরপতি গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবকেও।

দ্বিতীয় অধ্যায়টির মোট শ্লোক সংখ্যা একশ' একত্রিশ। এখানে প্রথম থেকেই কীর্তন প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে এবং কবি বলেছেন—
'কৃষ্ণরস যে গীত হোই। গীতগোবিন্দ কর্ণামৃত চিত্তই ॥' (১১)

জগন্নাথদাস বটগণেশের কাছে রাসমণ্ডপ নির্মাণ করিয়ে ওখানেই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রোতাদের জন্য তার ব্যাখ্যা করতেন (২২-২৩)। এখান থেকেই মাধব জগন্নাথ দাস প্রসঙ্গে 'স্বামী' এই অভিধা ব্যবহার করেছেন। এই অধ্যায়ে জয়দেবের জন্মস্থান প্রাচী নদীর কূলে বলে উল্লিখিত হয়েছে। এবং অনন্ত বর্মা চোড়গঙ্গদেব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার দরুণ তাঁর পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। অবশ্য চোড়গঙ্গদেব যে শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এরও উল্লেখ করেছেন মাধব। অনঙ্গভীমদেব (১২১১-৩৮ খ্রীঃ) শ্রীমন্দিরের বিমান এবং জগমোহনের সঙ্গে নাটমন্দির যোগ করেন এবং 'গীতগোবিন্দ সেবা'র প্রচলন করেন।

এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে মাধব অদ্বৈতমতবাদী সন্ন্যাসী শ্রীধর-স্বামীর কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, মূলত জ্ঞানমার্গের মানুষ হলেও ইনি পরিণত বয়সে ভক্তিমার্গের অনুসারী হয়ে ওঠেন। মাধব বলেছেন, শ্রীধরস্বামী কপিলাস ব্রহ্মচারী মঠের মহান্ত ছিলেন এবং শ্রীক্ষেত্রেই তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের 'ভাবার্থ দীপিকা' টীকা রচনা করেন। এই উপলক্ষে প্রতাপভানুদেব (১৩৫২-৭৮ খ্রীঃ) তাঁকে মাল্যচন্দন দিয়ে সম্মানিত করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের মতে (পৃঃ ১৩৯১) শ্রীধরস্বামী ১৩৫০-১৪৫০ খ্রীঃ

পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশা বিচারে প্রতাপভানুদেব কতৃক সম্বর্ধিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

মাধব বলেছেন যে শ্রীমন্দিরের চত্বরে কুকুর প্রবেশ করত। এটি রোধ করার জন্যে কপিলেন্দ্র দেব (১৪৩৫-৬৭ খৃীঃ) মন্দিরের চতুর্দিকে অত্যুচ্চ 'মেঘনাদ প্রাচীর' নির্মাণ করান। এটি নির্মাণ করতে পুরো এক বছর সময় লেগেছিল। এর পর মন্দির প্রাঙ্গণে কপিলেন্দ্র পুত্র রচিত 'পরশুরাম বিজয়' নাটকটি অভিনীত হয়। কপিলেন্দ্র পুত্র পুরুষোত্তম দেব (১৪৬৭-৯৭খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করার পর তিনিই 'ভোগমণ্ডপ' নির্মাণ করান? রথযাত্রার সময় দেবমূর্তিগুলিকে (চতুর্ধা) রথে নিয়ে আসার পর রাজা স্বর্ণ-মার্জনী দিয়ে রথগুলি ঝাড়ু দিয়ে দেবেন, এই "ছেরা পহরা" নীতি পুরুষোত্তমদেবই প্রবর্তন করেন এবং ঘোষণা করেন পুরীর রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাজারা প্রত্যেকেই মহাপ্রভুর 'প্রধান সেবক' বলে নিজেদের বিবেচনা করবেন। পুরুষোত্তম দেব 'নাচুনি সম্প্রদা' নিয়োগ করেন অর্থাৎ দেবদাসী প্রথার প্রচলন করেন।

তৃতীয় অধ্যায়ের মোট শ্লোকসংখ্যা একশ' একান্ন। কবি মাধব প্রথমেই একটি অজ্ঞাত তথ্য প্রকাশ করলেন। 'অভিনব গীত-গোবিন্দ' নামে একটি রচনা রাজা পুরুষোত্তম দেব কর্তৃক রচিত বলেই পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত। মাধব বললেন—দিবাকর নামে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন রাজা পুরুষোত্তম দেবেরও প্রিয়-পাত্র। তিনি একটি গীতিনাট্য রচনা করে 'রাজার নামেন ভণিলা। বহুত মেলানি পাইলা॥ শ্রীগীতগোবিন্দ নাট এ। অভিনব গীত বোলাএ॥' (৭-৮)। রাজা কবি-পণ্ডিতকে প্রচুর উপহার দিয়েছিলেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে, এরপর থেকে শ্রীমন্দিরে আগে 'অভিনব গীতগোবিন্দ' গীত হবে আর তারপর গীত হবে 'শ্রীগীতগোবিন্দ'।

পুরুষোত্তম দেবের রাজত্বকালে এই নীতিই প্রতিপালিত হোল কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর রাজা প্রতাপরুদ্রদেব সিংহাসনে আরূঢ় হবার পর জীবদেব নামে এক পণ্ডিত, যিনি ছিলেন 'বিদ্যা-বিবাদে' অত্যন্ত উৎসাহী, তিনি প্রতাপরুদ্রদেবকে বললেন—'এ নাট নুহইটি ভলা॥' (১৩)। মাধব ওড়িষ্যার এই বিশিষ্ট পণ্ডিত জীবদেবাচার্যকে

আগেই সম্মান জানিয়েছে। শ্রীমন্দিরে কোনটি গীত হওয়া প্রকৃত-পক্ষে উচিত, এই বিতর্কের সমাধান সহজ নয়। একদিকে বহু-মানিত পণ্ডিত জয়দেব গোস্বামীর সুললিত 'শ্রীগীতগোবিন্দ', অন্যদিকে রাজার পিতা পুরুষোত্তমদেবের ভণিতায় প্রাপ্ত 'অভিনব গীতগোবিন্দ'। সিদ্ধান্ত হোল—এর বিচারভার শ্রীমন্দিরের দেবতাই করবেন। তাই—

শ্রীছামুরে পুঁথি রখাই। কপাট কিলিলেক তহিঁ॥
অন্য দিবস প্রভাকালে। সেবক দেখিলে চক্ষুরে॥
বড়ঠাকুর গীত পোথি। তলরে অছইটি লোটি॥ (১৬-১৮)

'বড়ঠাকুর' অর্থে রাজার পিতৃদেব প্রয়াত পুরুষোত্তমদেবের ভণিতাযুক্ত 'অভিনব গীতগোবিন্দ' ভূলুণ্ঠিত এবং জয়দেব গোস্বামীর শ্রীগীতগোবিন্দখানি রত্নসিংহাসনের সামনে যথাস্থানেই রয়েছে—সেবকদের মুখে এই সংবাদ পাওয়ার পর প্রতাপরুদ্রদেব দুটি রচনা গীত হবার দু'টি পৃথক সময় নির্দিষ্ট করে দিলেন। মধ্যহ্ন ভোগের পর 'অভিনব গীতগোবিন্দ' এবং রাতের শেষ 'নীতি' 'বড় শৃঙ্গার' হবার পর 'শ্রীগীতগোবিন্দ' গীত হবে। কোনটিই পরিত্যক্ত হবে না। 'রাজার চারি অঙ্কে জান। এহুটি হোইলা ভিয়ান' (৩৬)—এর মানে ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই রাজাদেশ ঘোষিত হোল।

এরপর মাধব আবার নিজের কথায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। এই অধ্যায়ের ৮৫তম শ্লোক থেকে তিনি যে সব কথা ১০৩তম শ্লোকের মধ্যে বর্ণনা করেছেন, সে সব কথাই কবির পরিচয় প্রসঙ্গে আগেই বলে নিয়েছি। যাই হোক 'করণ' সন্তান জানতে পেরে রামানন্দ মাধবকে শুধু আশ্রয়ই দিলেন না তার শিক্ষারও ব্যবস্থা করলেন। এ প্রসঙ্গে মাধবের উক্তি—

পঢ়িলি পাঠ মু থোকাএ। ধইলি তালপত্র খোদাএ॥
বোইলা মো পাশে তু থিবু। মোহর বেভার বুঝিবু॥
রহিলি তাকু অনুসরি। কায়া কু এক ছায়া পরি॥
(১১১-১৩)

রামানন্দের কাছে পাঠ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আচরণ লক্ষ্য করে সেগুলিই শিক্ষা করতে তিনি মাধবকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

শিক্ষালাভের প্রকৃত এবং প্রকৃষ্ট পথ যে এটি, তা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন যিনি আদর্শ চরিত্রের অধিকারী গুরু। মাধব তেমন গুরুর কাছে ছায়ার মতোই থেকেছেন গুরুর দেহরক্ষার দিনটি পর্যন্ত। সেই সঙ্গে চলেছিল প্রচুর অধ্যয়ন আর পুঁথি লেখার অভ্যাস।

এই অধ্যায়ে মাধব বলেছেন রেমুনাতেই মাধবেন্দ্রপুরীর 'ফাগুন মাস পাঁচ অঙ্কে' (মার্চ, ১৫০০ খ্রীঃ) তিরোধান ঘটে।

'আঠ অঙ্ক ফাগুন মাসর। জগন্নাথ বল্লভ উভার'। (১২৬)—১৫০২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রতাপরুদ্রদেবকে 'জগন্নাথবল্লভ' নাটক শোনালেন রামানন্দ। দোল উৎসবের সময় পাঁচদিন এটি মন্দিরের প্রাঙ্গণে অভিনীত হয় এবং রাজা রামানন্দকে 'রায়' উপাধিতে ভূষিত করে একটি স্বর্ণনির্মিত যষ্টি উপহার দেন। একথা আগেই একবার বলেছি।

মাধবের উক্তি রাজার ন' অঙ্কে (১৫০৩ খ্রীঃ) প্রতাপরুদ্রদেব রায় রামানন্দকে রাজমহেন্দ্রীর শাসন দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। রাজার ত্রয়োদশ অঙ্কে (১৫০৭ খ্রীঃ) ওড়িষ্যায় প্রবল দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় (১৩৬)। এই সময় রামানন্দের পিতা ভবানন্দ দেহত্যাগ করেন আর তাঁর অন্য পুত্রেরা রাজার বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত হন।

মাধবের বক্তব্যগুলি স্বীকার করলে মেনে নিতে হয় যে ভবানন্দ পট্টনায়কের মৃত্যু হয়েছিল ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে। এঁর সম্পর্কে একমাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার অন্তর্ভুক্ত নবম পরিচ্ছেদে বলেছেন যে, গোপীনাথ মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তি পাওয়ার পর —

* * *

হেনকালে আইল তথা রায় ভবানন্দ ॥
পঞ্চপুত্র সহ আসি পড়িল চরণে।
উঠাইয়া প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে ॥

এই সাক্ষাৎকার কৃষ্ণদাসের রচনায় যে পর্বে এসেছে তাতে মনে হয় এটি ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী ঘটনা। কৃষ্ণদাস তথ্য সংগ্রহ করেছেন অন্যদের থেকে। যেখানে তথ্যের অনটন ঘটেছে সেখানে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। মাধবগুলি তাঁর বর্ণিত ঘটনাগুলির

প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। আশ্রয়দাতা রায় রামানন্দের নিজ সম্পর্কে ভ্রান্ত তথ্য দেবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ তাঁর দিকে নেই। তাছাড়া মাধব ভবানন্দের বাড়ীতেই প্রায় উপস্থিত হয়েছিলেন আর তিনিই মাধবকে পুত্র রামানন্দের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সে হোল ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কালের ঘটনা। মাধবেন্দ্রপুরীর প্রীতিভাজন ভবানন্দ ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে বা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন কিনা, এটি স্থিরভাবেহ বিবেচ্য। বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করি তিনি পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় দশকে জন্ম নেন।

এই সময় অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বহুপূর্ব থেকেই পরম বৈষ্ণব রায় রামানন্দ কীর্তনানন্দে মত্ত থাকতেন। রাজমহেন্দ্রীতে এসেও তিনি ঐ অভ্যাস বজায় রেখেছিলেন। এর বর্ণনায় মাধব বলেছেন—

রাজা আসিন তরজিলে। সৈনি ভেলাও বোইলে ॥
গলারে লাগিলাটি ফাঁস। তু বলু এবে কৃষ্ণরস ॥
এতে বেলে এ ভল নুহেঁ। সৈনি সজাও বেঢ়াএ ॥
কহই মাধব যে দাস। শুন ভগতে আন রস ॥ (১৪৮-৫১)

এইখানে তৃতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন মাধব।

'বৈষ্ণবলীলামৃতে'র চতুর্থ অধ্যায়ের মোট শ্লোক সংখ্যা একশ' ষাট। এর মধ্যে প্রথম সাতাইশটি শ্লোকে যে ঘটনাবলীর বিবরণ মাধব দিয়েছেন, সংক্ষেপে তা হোল—রাজার পরামর্শে, হয়তো বা কিছুটা ভর্ৎসনার ফলে রায় রামানন্দ ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্যদল নিয়ে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণরায়ের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই সময় উত্তর থেকে এসে গাজী ইস্মাইল পুরী মন্দিরের দেববিগ্রহ অপহরণ ও ধ্বংসের পরিকল্পনা নেন। শ্রীমন্দিরের সেবকরা পূর্বাহ্নেই এ সংবাদ পেয়ে যান আর নৃসিংহ উপরায় নামে এক ব্যক্তির সহায়তা নিয়ে দেববিগ্রহগুলিকে হাতির পিঠে বসিয়ে চিল্কা হ্রদের মধ্যস্থিত 'চড়াই' নামে একটি গুহার মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। কৃষ্ণবেন্বা নদীর তীরে প্রতাপরুদ্রদেবের কাছে এই দুঃসংবাদ পৌঁছলে তিনি আগে 'চড়াই' গুহায় দেবদর্শনে যান আর পরে সৈন্যবাহিনী নিয়ে গাজী ইস্মাইলকে গড় মান্দারণ পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে যান।

এরপর ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী শুরু হয়েছে ২৮তম শ্লোক থেকে। সেখানে মাধব বলেছেন—

একালে ক্ষেত্রে আগি মিলে। নবীন যতি ভক্ত মেলে ॥
নাম তা কৃষ্ণ চইতন্য। সাক্ষাত ঈশ্বর সমান ॥

(২৮-২৯)

এরপর শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহদর্শন করে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিভাবের পরম আবেশ বর্ণনা করেছেন মাধব। সার্বভৌম শ্রীচৈতন্যকে তাঁর গৃহে নিয়ে গেলেন। এরপর শ্রীচৈতন্যের সঙ্গীরা শ্রীমন্দিরে গিয়ে দেবদর্শন করে এলে সার্বভৌমের গৃহেই সকলে মহাপ্রসাদ ভোজন করলেন। (৩৩)। শ্রীক্ষেত্রে চৈতন্যদেব একমাস ছিলেন আর এর মধ্যে তাঁর কাজ ছিল দেবদর্শন আর শাস্ত্রচর্চা। বটগণেশের মূলে জগন্নাথ দাস রাসমণ্ডপ নির্মাণ করিয়ে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। সেখানে বসেই তিনি ভাগবত রচনা করতেন আর শ্রোতৃবৃন্দের কাছে কিছু কিছু অংশের ব্যাখ্যা করতেন। 'ভাগবতর ভাব যেতে। মধুর স্বরে গাএ নিত্যে' ॥ (৩৯)। একদিন শ্রীচৈতন্য সন্ধ্যের দিকে দেবদর্শনে গিয়ে জগন্নাথ দাসের ভাগবত ব্যাখ্যা শুনে—

নয়নু অশ্রু ঝরঝর। অঙ্গেন পুলক অপার ॥
জগন্নাথর এতে ভাব। চৈতন্য কলে তথি ঠাব ॥
বোইলে তু ভগতশ্রেষ্ঠ। ভগতিভাবে মতি পুষ্ট ॥
তো ভাব মু কাহু পাইবি। তোহর সঙ্গ ন ছাড়িবি ॥
'স্বামী তু' বোইলা চৈতনা। 'প্রভু তু' বোইলা আপন ॥
সমুদ্রে নদী যে মিশিলা। ভাবতরঙ্গ উভারিলা ॥

(৪৩-৪৮)

এরপর এসেছে বৈদান্তিক সার্বভৌমের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের শাস্ত্রালোচনার বিষয়। মাধব শুনিয়েছেন যে, সার্বভৌম শ্রীচৈতন্যকে পরামর্শ দিয়েছেন—'দক্ষিণ দেশ যেবে যিব। রাম রায় সঙ্গ লভিব'। কারণ প্রেমভক্তিবাদের রসজ্ঞ তিনিই।

শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ যাত্রার সময় গোদাবরী নদীতে স্নান সেরে নদীতীরে অপেক্ষমান, এমন সময় রাম রায় এসে পৌঁছলেন নদীতে স্নানের জন্যে। স্নান সেরে তিনি এলেন 'বালসূর্যের মতো

দীপ্তিমান' শ্রীচৈতন্যের কাছে। শ্রীচৈতন্য প্রশ্ন করলেন, 'তুমিই কি রাম রায়? তোমাকে তো দেখে এই দেশের রাজা বলেই মনে হচ্ছে।' উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করলেন—কবির ভাষায় 'মেঘে বিদ্যুত কি মিশিলে।' (৭৫)। রাম রায় শ্রীচৈতন্যকে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে প্রার্থনা জানালেন, উদ্দেশ্য—শাস্ত্রালোচনা। শ্রীচৈতন্য আতিথ্য স্বীকার করলেন এবং 'দুঁহে আলাপে রত হেলে। দশদিন কাল যাপিলে॥' (৮০)। এই আলোচনার সারাংশটুকু কবির ভাষায় জেনে নেওয়াই সঙ্গত মনে করি। মাধব বলেছেন—

পচারে চোরা নানা অর্থ। রাম রায় কহে উদত্ত॥
ভগতিমার্গর যে বিধি। রাগমার্গর যে অবধি॥
বহুত তত্ত্ব বখানিলা। বহুত সমাচার দেলা॥
গোপীভগতি ভাব যেতে ভাগবতর শ্লোক অর্থে॥
সাধ্য সে নিরূপণ কলা। ভজন উপায় বাঢ়িলা॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত। জয়দেব গীত গোবিন্দ॥
রাগমার্গর ভাব যেতে। সবু সে বুইলা তুরিতে॥
ভগতিভাব গরীয়সী। কহই প্রেম পরশংসি॥
প্রেমহি অটে পুরুষার্থ। ভগতি মার্গর পর্যন্ত॥
রায় কহই কান্তা প্রেম। ভজন মার্গ এ উত্তম॥ (৮১-৯০)

এখানে মাধব বলেছেন, রায় রামানন্দ রাগানুগা ভক্তিমার্গের আলোচনায় ব্রহ্মসংহিতা আর কৃষ্ণকর্ণামৃতের কথা তুলেছিলেন—এসবের আকর গ্রন্থ হিসেবে। এই দুটি গ্রন্থ চৈতন্য দক্ষিণ থেকে সংগ্রহ করেন। তাহলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, গ্রন্থ দুটির বিষয় বস্তু সম্পর্কে রামানন্দ সম্পূর্ণভাবে অভিজ্ঞ ছিলেন। চৈতন্য এগুলির কথা রায় রামানন্দের কাছে শুনে সংগ্রহে উদ্যোগী হন।

মাধবের বক্তব্য ওড়িয়া ভাষায় হলেও তা বৈষ্ণব দর্শনে অভিজ্ঞদের কাছে দুর্বোধ্য হবে না বলেই বিশ্বাস করি। তাই উদ্ধৃত অংশের বঙ্গানুবাদ দেওয়া থেকে আমরা বিরত থাকছি। ৯০তম ছত্রের পরেও মাধব আরও ৩৪টি শ্লোকে রাগানুগা ভক্তিতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার রাম রায়ের মুখ দিয়ে শুনিয়েছেন। মাধব যে রাম রায়ের সার্থক শিষ্য ছিলেন এবং এই বিশেষ ভক্তিমার্গ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণাও যে অত্যন্ত স্বচ্ছ ছিল, শ্লোকগুলি পাঠ করলে

যে কোন পাঠকেরই এই দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে উঠবে। রাম রায়ের মুখে ব্যাখ্যাগুলি শোনার পর—

প্রভু বোইল তু মো গুরু। শিখিলি তত্ত্ব তো মুখরু॥
গুরু পরায়ে স্মরুথিবি। ক্ষণে মনরু ন ছাড়িবি॥
রায় বোইলা শূদ্রাধম। মু ছার শাস্ত্রর প্রমাণ॥
গুরুপণরে গণ কাঁহি। অধম মুইটি অটই॥ (১২৫-২৮)

এ এক অপূর্ব বর্ণনা। বিনয়ের মূর্ত প্রতীক উভয়েই তাই উভয়ে উভয়ের কাছে ভক্তিতে সন্নত। যাই হোক, দশদিন আলোচনার পর শ্রীচৈতন্য গেলেন দক্ষিণে। ওদিক থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রীচৈতন্য রামানন্দকে শ্রীক্ষেত্রে চলে আসতে অনুরোধ করলেন। ফলে 'রাজার ঊনবিংশ অঙ্কেন। রায় মিলই নীলাচলেন॥ (১৪৪)। —১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে রায় রামানন্দ পুরীধামে চলে এলেন। রাজমহেন্দ্রীর শাসনকার্যে রায় রামানন্দ যে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন না, একথা রাজা প্রতাপরুদ্রদেবও বুঝেছিলেন। তাঁকে সে দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমন্দিরের দেখাশোনার দায়িত্ব-ভার রাজা রামানন্দের ওপর ন্যস্ত করলেন। দক্ষিণের শাসনভার পেলেন কবি জীবদেবাচার্য। তাঁকে 'বাহিনীপতি' উপাধিতে ভূষিত করলেন রাজা। বোঝা গেল জীবদেব শুধু কবিই ছিলেন না রাষ্ট্রনীতিবিদ্ এবং যুদ্ধকুশলীও ছিলেন। এদিকে রায় রামানন্দ শ্রীমন্দিরের দেখাশোনার ভার পেয়ে উল্লসিত। তিনি মন্দিরের মধ্যেই উত্তর পাশে একটি মণ্ডপ নির্মাণ করলেন আর ওখানেই শুরু হোল বৈষ্ণব গোষ্ঠীর কৃষ্ণলীলারস কীর্তন এবং আস্বাদন। মাধবের ভাষায়—

রচিলা মণ্ডপ সে এক। উত্তর পারুশ সমীপ॥
তঁহি বৈষ্ণবে গোষ্ঠী হেলে। কৃষ্ণ রসরে মতি দেলে॥
(১৫৮-৫৯)

এখানেই শেষ হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ের অতি মূল্যবান বিষয়-সমূহের বর্ণনা। মূল্যবান এই অর্থে যে, এগুলিই হোল রাগানুগা ভক্তিমার্গের সারাৎসার॥

পঞ্চম অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা একশ' চৌষট্টি। এর প্রথমাংশে আছে ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দের কিছু ঘটনা। এই বছরই রথযাত্রার কিছু

আগে রাজা প্রতাপরুদ্রদেব 'নবীন বয় যতি কথা'—শ্রীচৈতন্যের কিছু কথা রায় রামানন্দের কাছেই শুনেছিলেন। শ্রীমন্দিরের 'বুড়া লেংকা' আর 'তড়াউ করণ' শ্রীচৈতন্যের কথা বললেন আর 'পাঁজি' পড়ে শোনালেন। 'তড়াউ করণ' 'পাঁজি' বা দৈনন্দিন তথ্য লেখক। শ্রীমন্দিরের সমস্ত ঘটনা লিখে রাখা তাঁর কর্তব্য। 'লেংকা' শ্রেণীর সেবকদের কাজ সংবাদ আদান-প্রদান। এঁদের থেকে শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে বহু কিছু তথ্য শোনার পর এও তিনি জানলেন যে এই নবীন সন্ন্যাসী তখন পুরীতেই আছেন।

রথযাত্রার দিন রাজা 'ছেরা পহরা' বা রথ সম্মার্জনের জন্য গেলেন আর রথের ওপর থেকেই সংকীর্তনরত বৈষ্ণবদলের মধ্যে অলৌকিক রূপলাবণ্যের অধিকারী ভাবোন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন রায় রামানন্দ, কাহ্নাই খুণ্টিয়া, 'পঞ্চসখা', গদাধর পণ্ডিত, শিবানন্দ সেন, ভঁউরী দাস, রঘু অরক্ষিত দাস এবং আরও অনেকে (১০-১৩)।

কোন কোন চৈতন্যচরিত গ্রন্থে আছে দুবছর দক্ষিণ ভ্রমণ সেরে এসে (১৫১২ খ্রীঃ) চৈতন্য পুরী থেকে রথের আগে আবার বিদ্যা-নগরে রায় রামানন্দের কাছে চলে যান। মাধব বলেছেন এই বছর তিনি রথের সময় ছিলেন আর এখানেই রাজা প্রতাপরুদ্রদেব তাঁকে প্রথম দেখেন। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস নেবার আগে নীলাচলের রথযাত্রা দেখেননি। তাই দক্ষিণ ভ্রমণ সেরে পুরী এসে রথের আগেই রামানন্দের কাছে চার মাস কাটিয়ে আসেন বিশ্বাস করা কঠিন। মাধব এখানে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী হিসেবে যে 'ভঁউরী দাসে'র নাম উল্লেখ করেছেন তিনি হলেন ওড়িষ্যার ভক্তকবি এবং মথুরামঙ্গল, মনবোধ চৌতিশা প্রভৃতি রচয়িতা ভক্তচরণ দাস। 'রঘু অরক্ষিত দাস' হলেন রঘুদাস। ইনি নীলাচলবাসী চৈতন্যভক্ত আর এঁর নামোল্লেখ দেখা যায় চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার অন্তর্গত দশম অধ্যায়ে।

কীর্তনরত দলের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য রথের নিকটবর্তী হলে রথের ওপর থেকেই রাজা শ্রীচৈতন্যের কুশল প্রশ্ন করলেন। শ্রীচৈতন্য রাজার 'ছেরা পহরা' রীতির উল্লেখ করে জানালেন, 'তুম্ভে জগন্নাথ সেবক' অতএব দুর্লভ একটি সৌভাগ্যের অধিকারী। 'দেখিন ধন্য

হেলি মুহি” (১৮)—রাজাকে শ্রীজগন্নাথের সেবারত অবস্থায় দেখে আমি আমার জীবন ধন্য বলেই মনে করছি। শ্রীচৈতন্যের এই উক্তি রাজাকে মুগ্ধ করল। তিনি রায় রামানন্দের কাছে জানতে চাইলেন, শ্রীচৈতন্য কোথায় থাকছেন। তিনি জানালেন যে সার্বভৌমই তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন। রাজা জানালেন, শ্রীচৈতন্য বরং কাশী মিশ্রের গৃহেই চলে আসুন (২০), আর যেহেতু এই গৃহটি মন্দিরের নিকটবর্তী, শ্রীচৈতন্যের পক্ষে দেবদর্শনও সহজতর হবে।

এর আগেই শ্রীক্ষেত্রে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল যে "রাধার ভাব আস্বাদনে। জন্ম হোইলে মর্ত্ত্যধামে"—এমন যে সন্ন্যাসী, সেই শ্রীচৈতন্য শ্রীক্ষেত্রেই অবস্থান করছেন। (২৩)। তাঁর দৈনন্দিন কর্মধারার মধ্যে আছে একলক্ষবার নাম জপ এবং প্রভাত থেকেই নাম সংকীর্তন।

এই সময় শ্রীচৈতন্য জানালেন যে তিনি উত্তর দিকে যাত্রার অভিলাষী। যাত্রার দিন রায় রামানন্দ তাঁর সঙ্গী হলেন এবং কটক পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই রইলেন। এরপর শ্রীচৈতন্য রামকেলি গিয়ে রূপ ও সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। (৩১)। তিনি এঁদের রাজকার্য পরিত্যাগ করে বৃন্দাবন চলে যেতে পরামর্শ দিয়ে শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করলেন। এর কিছুদিন পরে তিনি প্রয়াগ তীর্থে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এরই মধ্যে একদিন রূপ গোস্বামী এলেন শ্রীক্ষেত্রে। তিনি খর্বকায় এবং কৃষ্ণবর্ণ দেহের অধিকারী ছিলেন। শ্রীচৈতন্য এই পণ্ডিত ব্যক্তিটিকে নিয়ে গেলেন রায় রামানন্দের কাছে আর উভয়ের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কবির ভাষায়—

'চৈতন্য নেলে রায় পাশে। বোইলে রূপ এ প্রকাশে ॥
এহাকু তত্ত্ব শিক্ষা দিঅ। রসর মার্গটি বতাও ॥
রায় রূপকু সম্ভাষিলে। রসতত্ত্ব সে শিক্ষা দেলে ॥
(৪৩-৪৫)

রূপ ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং চিন্তাশীল মানুষ। ফলে তাঁর মতো বিদগ্ধ ব্যক্তির পক্ষে রায় রামানন্দ বর্ণিত রাগানুগা ভক্তিমার্গের তত্ত্ব অনুধাবনে বিলম্ব হোল না। আবার অন্যদিকে, রূপ এই রসেরই মার্গানুসন্ধানী জেনে, রায় রামানন্দও কোন কিছু

গোপন করেননি। এরপর রূপ গেলেন জগন্নাথ দাসের কাছে। তাঁর কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু আলোচনাও তিনি শুনলেন। এই মহাভাগবত জগন্নাথ দাস যখন ভাগবতের ভক্তিতত্ত্ব বর্ণনা করছিলেন তখন তাঁর ভক্তিরোমাঞ্চিত কলেবর এবং অন্যান্য সাত্ত্বিকভাবের প্রকাশ দেখে রূপ অত্যন্ত মুগ্ধ হন। আলোচনার সময় ব্রহ্মসংহিতা এবং কৃষ্ণকর্ণামৃতও আলোচ্য বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। রূপ কিন্তু তখনো শ্রীমন্দিরে গিয়ে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করেন নি। তাই কাশী মিশ্র কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাছাড়া রূপ জপতপ করতেন না, ম্লেচ্ছ রাজার কর্মচারী ছিলেন—এগুলিও মিশ্রের পক্ষে অসন্তোষের কারণ হয়ে উঠেছিল। (৪৭-৪৮)

১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে কবীর এলেন শ্রীক্ষেত্রে। মাধব বললেন—

রাজাঙ্ক অঙ্ক চউবিংশে। উত্তরু সন্ন্যাসী এ আসে ॥
নাম তা ঝোলিআ কবীর। কষা বসন দেহে তার ॥
তম্বুরা এক ধরি হাত। মধুর স্বরে গাএ গীত ॥
জগন্নাথরে ভাব তার। মতি তা বড়ই উদার ॥

(৬২-৬৫)

মুসলমান বংশজ তন্তুবায়দের 'জোলা' বলা হয়। সম্পাদক ড. রথের মতে 'ঝোলিয়া' শব্দটি ঠিক 'জোলা' শব্দ থেকেই এসেছে। অবশ্য কবীর (আঃ ১৪৪০-১৫১৮ খ্রীঃ) একজন মুসলমান জোলার গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। আমাদের মনে হয় শব্দটি ঠিক 'জোলা' শব্দজ নয়। সন্ন্যাসী কবীর বেরিয়েছেন দেশ ভ্রমণে। তাঁর কাঁধে নিশ্চয় বস্ত্র নির্মিত একটি বৃহৎ ঝোলা ছিল, যার মধ্যেই তিনি তাঁর দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তুগুলি রাখতেন। স্কন্ধে বৃহৎ একটি ঝোলা বহনকারী সন্ন্যাসীকেই সম্ভবত মাধব 'ঝোলিআ কবীর' বলেছেন। 'জোলা' শব্দ থেকে 'ঝোলিয়া'—বড় দূরবর্তী মনে হয়।

জগন্নাথ দাস কবীরের ভক্তিরসাপ্লুত সংগীত শ্রবণে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে আলিঙ্গন করেন। এঁদের উভয়ের মধ্যে যে আলোচনা হয় তার সার সঙ্কলন করে মাধব বলেছেন যে, জগন্নাথ বলেছিলেন —ভগবানের সৃষ্ট মানুষের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই, সব মানুষই সমান ; নামকীর্তনের মাধ্যমেই ভগবৎ সান্নিধ্যলাভ সহজতম আর

ভক্তিবাদের যাঁরা পথিক তাঁদের কাছে মুক্তির কামনা ঘৃণ্য বলেই বিবেচিত অতএব পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। (৬৮-৭০)

উত্তর থেকে এরপর একসময় এলেন সনাতন। (৭৩)। তিনি ছিলেন রোগাক্রান্ত। দুষ্ট ব্রণের আক্রমণে তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এই পরম পণ্ডিত মানুষটি রথের তলায় আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তাঁকে রক্ষা করেন স্বরূপ দামোদর, তুলসী পরিছা, কাহ্নাই খুণ্টিয়া, অনন্ত, অচ্যুতানন্দ, যশোবন্ত প্রভৃতি বৈষ্ণবেরা। (৭৫-৭৭)। সনাতনের মতো জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির পক্ষে আত্মহত্যার চেষ্টা যে অত্যন্ত অন্যায়, এটি শ্রীচৈতন্য প্রকাশ করেন এবং তিনি সিদ্ধান্ত জেনে ক্ষুণ্ণ হন। (৮০-৮১)। সনাতন এক বছর পুরীতে ছিলেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। মাধব বলেছেন 'এক বরষ সে রহিলা, অনেক তত্ত্ব সে বুঝিলা।' (৮২)। তিনিও জগন্নাথ দাসের কাছে ভক্তিতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, জীব ও লীলাতত্ত্বসম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেন। আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে ভেদাভেদতত্ত্বও ছিল অন্যতম। জগন্নাথ দাস সনাতনকে শোনালেন, জীব ও ব্রহ্ম এক নয়—উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে। জীব স্বয়ং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের দাস। পরবর্তীকালে বৃন্দাবনে রূপ ও সনাতন জগন্নাথ দাস এবং রায় রামানন্দের সঙ্গে আলোচিত বিষয় সমূহকে বিশিষ্ট রূপদান করেন।

এই সময় বল্লভাচার্য শ্রীক্ষেত্রে আসেন। তিনি এসেছিলেন রথযাত্রা দর্শনের জন্যে। 'রথকু আসি মাস দুই। রহিলে বল্লভ গোঁসাই'॥ (১৬০) বল্লভাচার্য শ্রীক্ষেত্রে এসেছিলেন ১৫১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে পাই যে বল্লভাচার্যের মধ্যে পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল। রথযাত্রার সময় সেবার অদ্বৈত আচার্যও পুরীতে ছিলেন। বল্লভাচার্য অদ্বৈতকে প্রশ্ন করেন, 'কৃষ্ণ যখন আপনাদের স্বামী, তখন তাঁর নাম আপনারা উচ্চারণ করেন কেন?' অদ্বৈত উত্তর দিয়েছিলেন, 'স্বামীর আজ্ঞাই বলবতী। তাঁর নাম অবিরাম উচ্চারণ করতে তিনিই আজ্ঞা দিয়েছেন।' তিনি নাকি শ্রীচৈতন্যকেও বলেছিলেন, 'আমি স্বামীর (শ্রীধর স্বামী) ব্যাখ্যা মানি না।' এতে শ্রীচৈতন্য মন্তব্য করেন, 'যে স্বামীকে মানে না, সে তো বেশ্যা।' বল্লভাচার্য ও গদাধর

পণ্ডিতের কাছে মন্ত্রদীক্ষা নেন। তাঁর তিরোধান ঘটে ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে। (পৃঃ ১৩৬২)

এবার মাধব রাজার সপ্তবিংশ অঙ্কের (১৫১৮ খ্রীঃ) ঘটনাবলী বিবৃত করেছেন। জগন্নাথ দাসের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের প্রীতির সম্পর্কটি ছিল অত্যন্ত নিবিড়। জগন্নাথ তাঁকে একবার বলেছিলেন, শ্রীচৈতন্যের জন্ম শ্রীকৃষ্ণের হাসি থেকে, অপর পক্ষে শ্রীরাধার হাসি থেকে তাঁর নিজের উদ্ভব। মাধবের ভাষায়—

রাধাকু অনাই হসিলা। কৃষ্ণহাস সুধা ঝরিলা ॥
কৃষ্ণর হাসু তো জনম। রাধা হাসরু মো জনম ॥
(১১৭-১৮)

তাঁদের উভয়ের উদ্ভব বা আবির্ভাব রহস্য জগন্নাথ দাস যে ভাবে ব্যাখ্যা করলেন তা শুনে শ্রীচৈতন্য অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং—

প্রভু সে প্রেমে আলিঙ্গিলা। এ অতিবড়টি বোইলা ॥
তোহ মোহর এক প্রাণ। দেহটি মাত্রক যে ভিন্ন ॥
অতিবড় একথা কহু। অতিবড় হেলু আজহুঁ ॥
কাঁধরু উত্তরী কাড়িলা। স্বামী মস্তকে জড়ি দেলা ॥
বোলে এ অতি বড় পণ। স্বামী তু মোহর পরান ॥
প্রভু বোলই স্বরূপকু। এ অতিবড় বোলিবাকু ॥
(১১৯-২৪)

শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ দাসের মন্তব্য রায় রামানন্দ আর পঞ্চসখার বাকী চারজনকেও শোনালেন। তাঁরা সকলেই জগন্নাথ দাসকে দেওয়া 'অতিবড়' অভিধাটি স্বীকার করে নিয়ে—'সকলে কলে অঙ্গীকার। এ অতি বড়র বেভার ॥' (১২৮)।

পঞ্চসখার মধ্যে বলরাম ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং 'যোগ পুরুষ'। তিনি রামায়ণ রচনা করেন এবং স্বীয় ভক্তিনিষ্ঠা, নীতিজ্ঞান, গভীর পাণ্ডিত্য ইত্যাদি প্রকাশ করে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠেন। বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবেও তিনি ছিলেন পরম সম্মানিত।

এখানে মাধব বলরাম সম্পর্কে একটি কাহিনী শুনিয়েছেন। একবার রথযাত্রার সময় বলরাম ফুলের মালা আর চন্দন নিয়ে রথের ওপরে গিয়ে ওঠেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, দেববিগ্রহগুলিকে

মাল্যভূষিত এবং চন্দনচর্চিত করা। বলরাম শূদ্র। রথের ওপরে যে সব সেবকেরা ছিলেন তাঁরা বলরামের কাজে শুধু বাধাই দিলেন না, তাঁকে রথ থেকে নামিয়ে দিলেন। অপমানিত বলরাম সোজা চলে গেলেন সমুদ্রতীরে। সেখানে তিনি বালি দিয়ে একটি রথ বানিয়ে শ্রীমন্দিরের বিগ্রহদের সাদর আহ্বান জানালেন। ভক্ত বলরামের আকুল আহ্বানে দেবতারা সাড়া দিয়ে বালুকানির্মিত রথেই সকলের অলক্ষে অধিষ্ঠিত রইলেন। এদিকে পুরীর 'বড়দাণ্ডে' (রাজপথে) রথগুলির চাকা গতি হারালো। কোন প্রকারেই সেগুলিকে সচল করা গেল না। সেবায় কোন ত্রুটি ঘটেছে এই আশংকায় সেবকেরা রথ টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা ত্যাগ করলেন। শোকাকুল গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলেন। রাত্রে তিনি সমস্ত ঘটনাই স্বপ্নে দর্শন করলেন। পরদিন প্রাতে স্বয়ং সমুদ্রতীরে গিয়ে বলরামের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁকে সসম্মানে রথের ওপর নিয়ে এলেন। বলরাম একে একে দেববিগ্রহগুলিতে মাল্যচন্দন অর্পণ করার পর রথের চাকা তার সহজ গতি ফিরে পেলো। (২৩৩-৬৪)। রাজা বলরাম দাসকে আনবার জন্যে যাঁদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন জগন্নাথ দাস, কাশী মিশ্র, তপন আচার্য, কাহ্নাই খুণ্টিয়া, অনন্ত আচার্য, পঞ্চসখার বাকী তিনজন (অনন্ত, অচ্যুত, যশোবন্ত), তুলসী মিশ্র এবং দামোদর পণ্ডিত। ভক্ত বলরাম—'যোগ পুরুষ'-এর এই কাহিনী বর্ণনা করেই মাধব তাঁর কাব্যের পঞ্চম অধ্যায় শেষ করেছেন।

কাব্যটির ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে ৯৩টি শ্লোক এবং শ্রীচৈতন্য মুখ নিঃসৃত শিক্ষাষ্টক ও সেগুলির মাধবকৃত অনুবাদ। অধ্যায়টি শুরু হয়েছে মহামন্ত্রের মূল রূপ নিয়ে গৌড়ীয় এবং উৎকলীয় ভক্তদের বিবাদ দিয়ে।

শিবানন্দ বলে হরেকৃষ্ণ। কাহ্নাই বলে হরেরাম।
মন্ত্রর আগ কিস হই। এ ঘেনি তর্ক উপজয়ী॥ (৩-৪)

এই বিবাদের যখন সমাধান উভয়ের মধ্যে হোল না, তখন তাঁরা গেলেন স্বরূপ দামোদরের কাছে। সব শুনে স্বরূপ জগন্নাথ দাসের অভিমত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। জগন্নাথ দাস বললেন,

এই বিষয়ের সমাধান করতে সমর্থ একমাত্র শ্রীচৈতন্য স্বয়ং। শ্রীচৈতন্য মহামন্ত্রটির প্রকৃত রূপ কী হওয়া উচিত এর আলোচনায় রামানন্দের উপস্থিতিও যে বাঞ্ছনীয়, সে কথা জানালেন। মন্দিরের উত্তর পার্শ্বস্থিত মণ্ডপে বিচার সভা বসল। সভাপতি রইলেন শ্রীচৈতন্য। বহু আলোচনার পর স্থির হোল উৎকলে 'হরেরাম' আগে উচ্চারণ করার প্রবণতা দীর্ঘকালীন, আবার গৌড়ে কিন্তু 'হরেকৃষ্ণ'ই প্রথম উচ্চারিত হয়। কোন প্রদেশের রীতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আছে, এ কথা সভায় স্বীকৃত হোল না, বরং স্থির হোল দু'টি প্রদেশে দু'টি রীতিতেই মহামন্ত্রের কীর্তন হোক। (১৮)

শিবানন্দ সেন আর কাহ্নাই খুণ্টিয়ার মধ্যে সদ্ভাবের অভাব ছিল। প্রতি বছর রথযাত্রার সময় উভয়েই বহু গৌড়ীয় ভক্তকে শ্রীক্ষেত্রে নিয়ে আসতেন আর এতে উভয়েরই কিছু অর্থার্জন হোত। শিবানন্দ সেনের প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে উল্লিখিত দেখা যায়, 'ইনি প্রতিবর্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে লইয়া ঘাটি সমাধান করতঃ নীলাচলে যাইতেন।' (পৃঃ ১৩৪৮)। বিষয়টির উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃতেও আছে। সেবার যাত্রীদের বাসস্থান নিয়ে উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হলে কাশী মিশ্র মধ্যস্থতা করেন এবং উভয়ের 'যজমান' গুলির বাসস্থান সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। প্রকৃত পক্ষে এই যাত্রীরা রথযাত্রার পরই গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করতেন না, 'চাতুর্মাস্যা' (আষাঢ়ের শুক্লা-দ্বাদশী বা পূর্ণিমা থেকে কার্তিকমাসের শুক্লা-দ্বাদশী বা পূর্ণিমা পর্যন্ত) শেষ করে ফিরতেন। তাই এঁদের বাসস্থান স্থির করা সমস্যার বিষয়ই ছিল। (২৫)।

শিখী মাহাতির বোন মাধবী দাসী ছিলেন বালবিধবা কিন্তু ভক্তিমতী। তিনি ভক্তিরসাশ্রিত গীত শুনিয়ে জগন্নাথ দাসকেও প্রীত করেন এবং শ্রীচৈতন্যের অনুমতি নিয়ে বৈষ্ণব-ইষ্টগোষ্ঠীতে বসতেন। কিছু গৌড়ীয় ভক্ত মাধবী দাসীর বৈষ্ণবগোষ্ঠীর মধ্যে স্থান গ্রহণকে সুনজরে দেখতেন না। তাঁরা ধীরে ধীরে এই ইষ্টগোষ্ঠী বর্জন করলেন। জগন্নাথ দাস মাধবীর ভক্তিভাব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতেন না কিন্তু একথাও বলতেন যে,

নারীর সঙ্গ বৈষ্ণবদের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। তিনি স্পষ্টভাবেই জানালেন যে, বৈষ্ণবরা প্রকৃতিগতভাবেই আবেগপ্রবণ। ইষ্টগোষ্ঠীতে নারীর উপস্থিতি তাঁদের পক্ষে সাধনায় মনঃসংযোগের বাধা হয়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। কাঠ বা পাথরের তৈরি নারী-মূর্তির দর্শনও তাঁদের পক্ষে বর্জনীয়। মাধবী রক্তমাংসের নারী অতএব বৈষ্ণবগোষ্ঠীর মধ্যে তার উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি সৃজন করতে পারে।

জগন্নাথ দাসের এই বক্তব্য এবং তাঁরই জন্য কিছু গৌড়ীয় ভক্ত বৈষ্ণব মণ্ডলীতে যোগদান করা থেকে বিরত থাকছেন, এসব জেনে মাধবী নিজেই ইষ্টগোষ্ঠীতে যোগদান দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। (৪১) শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে আগত বঙ্গীয় ভক্তেরা সকলেই কিন্তু মহাপুরুষ ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে ছোট হরিদাস (যিনি কীর্তন গায়ক হিসেবেই শ্রীচৈতন্যের প্রীতিধন্য হয়েছিলেন) মাধবীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর বাসভবনে যাতায়াত শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে রন্ধনের জন্য চাল, নুন এসবের অভাব আছে—এই অছিলায় তিনি এগুলি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মাধবীর গৃহে যেতেন। এতে মাধবীর অর্থাৎ শিখী মাহাতীর প্রতিবেশীরাও নিন্দাবাদ শুরু করেন। শিখি এবং মুরারি এই দুইভাই ছোট হরিদাসকে তাঁদের বাড়ি যেতে মানা করেছিলেন কিন্তু হরিদাস তাতে কর্ণপাত করেন নি। এক রাত্রে আপন গৃহে হরিদাসকে দেখে শিখী তাঁকে প্রহার করেন। হরিদাস বিষয়টি গৌড়ীয় সঙ্গীদের এবং সেই সঙ্গীরা শ্রীচৈতন্যকে জানালেন। সব শুনে শ্রীচৈতন্য ঘোষণা করলেন যে তিনি আর ছোট হরিদাসের মুখ-দর্শনও করবেন না। নিন্দা এবং অপমানে দগ্ধ হয়ে ছোট হরিদাস শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গেলেন এবং গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন করলেন।

ছোট হরিদাসের আত্মহত্যার সংবাদ শ্রীক্ষেত্রে প্রচারিত হওয়ার পর বঙ্গীয় ভক্তরা খুবই বিচলিত হন। জগন্নাথ দাসের প্রতি শ্রীচৈতন্যের প্রগাঢ় প্রীতি, বহু উৎকলীয় ভক্তদের প্রতি তাঁর আত্যন্তিক স্নেহ কিছু গৌড়ীয় ভক্তকে ক্ষুণ্ণ করেছিল। তাঁরা এখন স্থির করলেন যে, শ্রীচৈতন্য ছোট হরিদাসের প্রতিও

সুবিচার করেননি আর এ থেকে অবশ্যই ধরে নেওয়া যায় যে গৌড়ীয় ভক্তদের প্রতি শ্রীচৈতন্যের কৃপা হ্রাস পেয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের অবিলম্বে শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করে গৌড়ে প্রত্যাবর্তনই শ্রেয়। শ্রীচৈতন্য অদীক্ষিত জগন্নাথ দাসকে 'অতিবড়' আখ্যা দিয়ে বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের অমর্যাদা করেছেন শুধু নয় তাঁকে 'স্বামী' আখ্যা দিয়ে বৈষ্ণব মণ্ডলীর শিরোমণি করে তুলেছেন। এ অবস্থায় যদি গৌড়ীয় ভক্তরা শ্রীক্ষেত্র থেকে চলেও যান তাতে শ্রীচৈতন্যের কিছু এসে যাবে না। তাঁরা এক প্রভাতে চলে গেলেন।

বিষয়টি জানতে পেরে স্বরূপ দামোদর, শিবানন্দ সেন এবং গদাধর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের কাছে গিয়ে সব নিবেদন করলেন। শিবানন্দ স্পষ্ট ভাষায় শ্রীচৈতন্যকে জানালেন যে তাঁরই আচরণে ক্ষুণ্ন হয়ে যখন ভক্তেরা শ্রীক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছেন, তাঁদের ফিরিয়ে আনার নৈতিক দায়িত্ব শ্রীচৈতন্যেরই। (৭০)। শিবানন্দের ভাষাটি মাধবের লেখনীতে এসেছে—

শিবানন্দ বলে হকার। তোহর এ নহে বেভার ॥
তোর নিমিত্ত এথে থিলে। এবে সে সবে চালি গলে ॥
একথা নোহি তোতে ভল। লেউটি অনাও ক্ষেত্রর ॥

(৬৮-৭০)

—শিবানন্দ বড় গলায় বললেন, 'এ তোমার দিক থেকে উচিত ব্যবহার হয়নি। তাঁরা সবাই এখানে ছিলেন তোমারই জন্যে, এখন সবাই চলে গেলেন। এতে তোমার মঙ্গল হবে বলে আমি মনে করিনে। ওঁদের শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনাই তোমার কর্তব্য।' শ্রীচৈতন্যের পক্ষে তাঁর ভক্তদের অভিমানাহত অন্তরের বেদনা বুঝতে বিলম্ব হোল না, অপরদিকে জগন্নাথদাসও সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁর ভক্তগোষ্ঠীর যে বিচ্ছেদ ঘটে গেল, এর অন্যতম প্রধান কারণ তাঁর প্রতি প্রভুর অসীম ভালোবাসা। তাই তিনি যখন জানলেন শ্রীচৈতন্য স্বয়ং যাবেন ভক্তদের ফিরিয়ে আনতে, জগন্নাথদাস সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গী হয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু শিবানন্দ সেন উভয়কেই মানা করলেন। আলোচনায় স্থির হোল—শ্রীচৈতন্যের একটি চিঠি নিয়ে

শিবানন্দই দূত হয়ে বঙ্গীয় ভক্তদের ফিরিয়ে আনার জন্য রওনা হবেন। তখন শ্রীচৈতন্য জগন্নাথদাসকে উদ্দেশ করে বললেন।

প্রভু বোইলা লেখ চিঠি। ফেরিন আসিবে লেউটি ॥
স্বামী লেখিলা আঠ শ্লোক। প্রভুর ভাব সে যেতেক ॥
প্রভুকু শ্লোক শুনাইলা। বিভোলে প্রভু কোল কলা ॥
শিবানন্দ যে ঘেনি গলা। প্রভু সে লেখিছি বোইলা ॥
(৭৪-৭৭)

—প্রভু বললেন, ঠিক আছে একটি চিঠিই লেখ; সে চিঠি পেলে ওঁরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবেন। এর পর জগন্নাথদাস প্রভুর উল্লিখিত ভাবসমূহ নিয়ে আটটি শ্লোক রচনা করে প্রভুকে শোনালেন। আনন্দে উদ্বেল হয়ে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথদাসকে আলিঙ্গন করলেন। শিবানন্দ সেই চিঠি নিয়ে গৌড় অভিমুখে যাত্রাকারীদের কাছে গিয়ে সেটি শ্রীচৈতন্য লিখেছেন বলে তাঁদের হাতে দিলেন। তাঁরা তখন যাজপুরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাঁরা চিঠির বক্তব্য জানলেন কিন্তু না শিবানন্দ, না শ্রীচৈতন্য—কারও প্রত্যাশাই পূর্ণ হোল না। তাঁরা সকলে বঙ্গদেশের পথেই রওনা হয়ে গেলেন।

বঙ্গদেশে পৌঁছবার পর বড় অংশটি নবদ্বীপেই রয়ে গেলেন কিন্তু অল্প কয়েকজন গেলেন বৃন্দাবন। তাঁরা রূপ ও সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং রূপ তাঁদের বৃন্দাবনে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। ওখানে গিরিগোবর্ধনে শ্রীবল্লভের পূজিত গোপালের সেবাপূজার অধিকার যদি গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা অর্জন করতে পারেন তবে তাঁদের বেশ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আসবে চিন্তা করে তদানীন্তন গোপাল-সেবকদের তাঁরা বিতাড়নের চেষ্টা করেন। এতে যে তাঁরা শুধু বিফলই হলেন তাই নয়, বৃন্দাবন পরিত্যাগেও বাধ্য হন। এ সংবাদ শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছলে শ্রীচৈতন্য অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি গৌড়ীয় ভক্তদের এই স্বভাবের নিন্দা করেন।

এরপর মাধব 'শিক্ষাষ্টক' বলে পরিচিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করে সেগুলির ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

গ্রন্থটিতে এরপর এসেছে সপ্তম অধ্যায় যার শ্লোক সংখ্যা একশ আটচল্লিশ। প্রথমেই এসেছে জগন্নাথদাস প্রসঙ্গ। তিনি দীক্ষিত নন

অথচ শ্রীচৈতন্য তাঁকে 'স্বামী', 'অতিবড়' এইসব বিশেষণে বিশেষিত করেছেন, এতে মনে হয় জগন্নাথদাসও নিজেকে অপরাধী মনে করলেন। তিনি একদিন মহাপ্রসাদ নিয়ে শ্রীচৈতন্যের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে দীক্ষা দেবার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন কিন্তু শ্রীচৈতন্য তাঁকে বয়োজ্যেষ্ঠ বলরামের কাছেই দীক্ষা গ্রহণ করতে উপদেশ দেন —একাহিনী পরবর্তীকালে দিবাকর দাস রচিত 'জগন্নাথচরিতামৃত' পুঁথিখানির মধ্যে আছে। এখানে আছে ১৫১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথদাসকে বলরাম দাসের কাছ থেকে দীক্ষা নিতে পরামর্শ দেন আর জগন্নাথও সেই পরামর্শ মতো বলরামের কাছে দীক্ষা নেন। জগন্নাথদাস 'শাসনী ব্রাহ্মণ', তাঁর পক্ষে শূদ্র বলরামের কাছে দীক্ষাগ্রহণ কাশী মিশ্রের কাছে ক্ষমার অযোগ্য মনে হয়। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন কিন্তু জগন্নাথ এই জাতি সম্পর্কিত ভেদচিন্তার প্রতি কোন মর্যাদাই দেখালেন না। এতে অবশ্য বৈষ্ণবদের একটি বড় অংশ তাঁর উদারতায় মুগ্ধ হন এবং কাজটি যে অত্যন্ত সঙ্গতই হয়েছে, এই অভিমত প্রকাশ করেন। জগন্নাথের উন্নত উদার দৃষ্টি বৈষ্ণব সমাজে প্রশংসিত হয়। (১-১৮)

শ্রীচৈতন্য প্রত্যহ 'গোবর্ধন' শালগ্রাম শিলা পূজা করতেন। উপরিউক্ত ঘটনার কিছুদিন পরেই সেই শালগ্রাম পূজার ভার শ্রীচৈতন্য শূদ্র রঘুনাথ দাস গোস্বামীর হাতে তুলে দেন। একথা কৃষ্ণদাস কবিরাজও শুনিয়েছেন। শ্রীক্ষেত্রের স্মার্ত পণ্ডিতেরা শ্রীচৈতন্যের এই কাজে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলেন, ক্ষুণ্ণ হলেন স্বয়ং বাসুদেব সার্বভৌমও। কিন্তু কেউই এর প্রতিবাদে শ্রীচৈতন্যকে কিছুই বলেননি। একমাত্র কাশী মিশ্রই ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন, আর কেউ নয়। তিনি নীলাচলের অন্যতম শ্রদ্ধেয় মানুষ আর রাজার গুরু। কিন্তু মাধব শুধু বলেছেন—'কাশী মিশ্র সে কোপ কলা।' এই ঘটনা প্রমাণ করে যে সমকালীন জাতিভেদপ্রথা প্রেমভক্তিবাদের স্রোতে তখন প্রার সবটুকুই ভেসে গিয়েছিল। বৈধীমার্গ পরিত্যাগ করে রাগমার্গের কীর্তনরীতি এই সময় থেকেই শুরু হয়। এই নবীন ভাবস্রোতকে বলবতী করে তুলতে পঞ্চসখাও রাগমার্গীয় কীর্তনে মন দিলেন। গোপীভাবে কৃষ্ণের ভজনপন্থার

কথা বহুকাল ধরে রায় রামানন্দ বলে আসছিলেন। পঞ্চসখা এবার সেই পথেরই পথিক হলেন। (১৯-৩০)

১৫১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ—এই দীর্ঘ সাত বছর ওড়িষ্যার সঙ্গে বিজয়নগরের যুদ্ধ চলেছিল। এরই মধ্যে খরা এবং বন্যার ফলে ওড়িষ্যায় ঘোরতর দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি দেখা দেয়। ওড়িষ্যার অর্থনৈতিক অবস্থা ধ্বংসের মুখোমুখী এসে দাঁড়ায়। একে এই অর্থনৈতিক সংকট, সৈন্যদের জন্য খাদ্য সংগ্রহও একটি বিরাট সমস্যা আর তখনই ওড়িষ্যার তিনদিক থেকেই শত্রুপক্ষ প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে থাকলো। দক্ষিণের দু'টি দুর্গ শত্রুদের হস্তগত হোল। প্রায় দুর্ভেদ্য শেষ দুর্গটি, 'কোণ্ডাবিড়ু' সৈন্যদের আশ্রয় হয়ে উঠলো। দক্ষিণের সমগ্র সৈন্যবাহিনী গজপতির ইঙ্গিতে ঐ দুর্গে সমবেত হোল। দুর্গের নেতৃত্ব রইলো রাজপুত্র বীরভদ্রদেবের হাতে। কিন্তু তাঁর সহায়তার জন্য গেলেন জীবদেবাচার্য ও অন্য কিছু যুদ্ধনিপুণ সামন্ত। প্রায় দশহাজার সৈন্য এই দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল। কৃষ্ণদেব রায়ের সৈন্যেরা কোণ্ডাবিড়ু দুর্গ ঘিরে রইল যাতে বাইরে থেকে কোন সাহায্য দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। সেটি ছিল গ্রীষ্মকাল। দুর্গের মধ্যে খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে শত শত সৈন্য প্রাণত্যাগ করলো। প্রায় একমাস অবরোধের পর কৃষ্ণদেব রায়ের সৈন্যবাহিনী দুর্গের প্রধান দরজা ভেঙে ফেললো। ভেতর থেকে প্রথম প্রতিরোধ-বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন 'বাহিনীপতি' জীবদেবাচার্য। তিনি নিহত হলেন। রাজকুমার বীরভদ্রদেবকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হোল বিজয়নগর সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-সীমান্তবর্তী একটি সুরক্ষিত জায়গায়। (৩১-৬১)

গজপতিপুত্র বীরভদ্রদেব বীরই ছিলেন। খড়্গ চালনায় তাঁর কৃতিত্বের কথা কৃষ্ণদেব রায়ও শুনেছিলেন। তিনি বীরভদ্রের সেই দক্ষতার প্রমাণ দেখতে বীরভদ্রকে একজন সাধারণ সৈনিকের সঙ্গে খড়্গ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে আদেশ করলেন। আবার এ ঘোষণাও তিনি করলেন যে রাজাদেশ অমান্য করলে বীরভদ্রকে শাস্তি পেতে হবে। অপমানিত বোধ করলেন বীরভদ্র এবং সাধারণ সৈনিকের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে আপন খড়্গের আঘাতে আত্মহত্যাই

করলেন। রাজা কৃষ্ণদেব রায় এই পরিস্থিতির কল্পনাও করেননি তাই অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলেন। রাজানুচিত মর্যাদার সঙ্গে রাজপুত্র বীরভদ্রের সৎকার করলেন কৃষ্ণদেব। গজপতি প্রতাপ-রুদ্রদেবের প্রধানা মহিষী চম্পাবতীও (বীরভদ্র-জননী) কৃষ্ণদেব রায়ের কাছে বন্দিনী ছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রদেব এবং বন্দিনী মাতা চম্পাবতীর কাছে বীরপুত্রের আত্মহত্যার সংবাদ পৌঁছলে প্রতাপরুদ্রদেব কৃষ্ণদেবের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করলেন। সন্ধির চুক্তিতে যে শর্তাবলী ছিল সেই অনুসারে রাজকন্যা জগন্মোহিনীর সঙ্গে কৃষ্ণদেব রায়ের বিবাহ হোল এবং ওড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ ভূভাগ কৃষ্ণদেব যৌতুক হিসেবে পেলেন। বলা বাহুল্য, চম্পাদেবী মুক্তি লাভ করলেন। সাত বছরের যুদ্ধ এইভাবে সমাপ্ত হোল। (৬২-৯২)

প্রতাপরুদ্রদেব এমনিতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা পোষণ করতেন না কিন্তু পুত্র এবং রাজ্যের বৃহদংশ হারিয়ে তিনি এখন মানসিক শান্তি কামনায় বৈষ্ণবদের সঙ্গলাভেয় জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত গজপতি শ্রীচৈতন্য এবং বৈষ্ণবদেব নামকীর্তনের মধ্যে আশ্রয় সন্ধান করতে আগ্রহী হলেন। পঞ্চসখা এবং অন্যান্য বৈষ্ণবেরা নামকীর্তনের প্রবাহ বইয়ে দিলেন—মধ্যমণি হয়ে রইলেন শ্রীচৈতন্য। রাজা এই নামকীর্তনের মধ্যে অনেকখানি সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন। (৯৩-১০১)

শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিগত জীবনে ১৫১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই একটি বিপুল পরিবর্তন দেখা গেল। তাঁর মধ্যে দিব্যোন্মাদময় মহাভাবের প্রকাশ ঘটল এবং তাঁর দৈনন্দিন জীবনচর্যার মধ্যেও লক্ষণীয় পরিবর্তন এসে গেল। তাঁর মধ্যে বালসুলভ ভাব দেখা গেল এবং তিনি এই সময় থেকেই লক্ষবার নাম জপের অভ্যাস ত্যাগ করেন। রথযাত্রার সময় রথের সামনে পরিকরসহ শ্রীচৈতন্যের নৃত্য ও কীর্তন দেখে গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব মুগ্ধ হলেন। রাধাভাবে আবিষ্ট শ্রীচৈতন্যের চোখ থেকে অশ্রুধারা বয়ে চলেছিল। রাজা রায় রামানন্দকে ডেকে এনে কিছু পরামর্শ করে নিয়ে রথের ওপর থেকে অগণিত দর্শকের কাছে শ্রীচৈতন্যকে 'প্রভু' বলে ঘোষণা করলেন। (১০২-১৪৮)

মাধব অষ্টম অধ্যায়টিতে মোট ১১৪টি শ্লোকে আরও কিছু নতুন তথ্য তুলে ধরেছেন। পঞ্চসখার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য প্রত্যহ প্রত্যূষে নগরকীর্তনে বেরোতেন। ঐ সময়টি হোল প্রতিটি গৃহে মা-বোনেদের প্রাতঃকালীন কিছু কর্তব্যপালনের সময়। কীর্তনের ধ্বনিতে শিশুরা জাগ্রত হয় এবং কীর্তন দর্শন-শ্রবণের জন্য ঘরের বাইরে চলে আসে আর মা-বোনের প্রাতঃকালীন কৃত্যে প্রায়ই বিঘ্ন উৎপাদন করে। একবার একটি শিশু দ্রুতগতিতে ঘরের বাইরে আসতে গিয়ে উঠোনের নিচে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পায় এবং তার মস্তকের ক্ষতস্থান থেকে কিছু রক্তপাত ঘটে। এতে আহত শিশুর মাতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শিশুর বিছানায় পরিত্যক্ত মলমূত্রলিপ্ত ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডগুলি কীর্তনকারীদের ওপর নিক্ষেপ করেন। শিশুর মলমূত্রকে পবিত্রবোধে শ্রীচৈতন্য নিক্ষিপ্ত বস্ত্রখণ্ডগুলিকে মৃদঙ্গের ওপর পেতে নিতে নির্দেশ দেন। এর-পর থেকে মৃদঙ্গের ওপর একটি ঢাক্‌নী বা খোল পরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় আর সঙ্গে সঙ্গে আবরণহীন মৃদঙ্গের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়। সেই থেকে মৃদঙ্গের অপর নাম 'খোল' হিসেবেও গৃহীত হয়। (১-৩০)

১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে পঞ্চসখাকে ডেকে শ্রীচৈতন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কীর্তনরস ছড়িয়ে দেবার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব সানন্দে গৃহীত হয় এবং শ্রীচৈতন্যসহ পঞ্চসখা বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে কীর্তনের জন্য যেতে শুরু করেন। শ্রীচৈতন্যের শেষ-জীবনের ১২।১৩টি বছর এইভাবে কীর্তন-রস প্রচারেই অতিবাহিত হয়। (৩১-৩৫)

আষাঢ় মাসের কৃষ্ণ-প্রতিপদ থেকে শ্রীমন্দিরে দেবদর্শন বন্ধ থাকে। এই সময় তীর্থে আগত যাত্রীরা নেত্রোৎসব পর্যন্ত দেব-দর্শনে বঞ্চিত থাকেন। ঐ দিনগুলিতে পঞ্চসখার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য আলালনাথে কীর্তনের জন্য যেতেন। ঐ সময় তাঁরা আলালনাথে ক্ষীরভোগ আস্বাদন করে তৃপ্ত হতেন। রায় রামানন্দ ঐ সময়ে পঞ্চসখাসহ শ্রীচৈতন্যকে বেণ্টপুরে অতিথি হিসেবে পেতেন এবং প্রচুর আদর-যত্ন করতেন। বৈষ্ণব গোষ্ঠী আষাঢ় অমাবস্যাতে পুরী প্রত্যাবর্তন করতেন। তারপরই রথযাত্রা এসে পড়তো আর রথের

সময় রথের সামনে নৃত্যগীত তাঁদের পক্ষে পুণ্যকৃত্য বলে পরিগণিত হোত। (৩৬-৪১)

পৌষমাসের পূর্ণিমা তিথিতে মহাপ্রভু বৈষ্ণবগোষ্ঠীসহ কীর্তন করতে ভুবনেশ্বর আসতেন। লিঙ্গরাজ মহাপ্রভুকে তাঁরা তুলসী এবং বিল্বপত্র দিয়ে পুজো করতেন আর তারপর কীর্তন করতেন। শেষে অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে কীর্তন করে প্রসাদ পেয়ে প্রত্যাবর্তন করতেন। তাঁরা গৌরীকুণ্ডে স্নান করে কেদারেশ্বরের পুজো করতেন আবার মাঝে মাঝে বিন্দুসরোবরে অবগাহন করে আনন্দলাভ করতেন। একাম্র ক্ষেত্র থেকে (ভুবনেশ্বর) এঁরা প্রতি বছর নিয়ালী মাধব-মন্দিরেও যেতেন। প্রাচী নদীতে স্নান সেরে নিয়ালী মাধব মন্দিরে পুজো করতেন। এই মন্দিরের অদূরবর্তী কেন্দুলীতে জয়দেব গোস্বামীর আবির্ভাব ঘটেছিল। গোস্বামীর জন্মস্থান শ্রীচৈতন্য ও পঞ্চসখার পক্ষে ছিল একটি পরম তীর্থ। তাঁরা কেন্দুলী গ্রামের মধ্যে গিয়ে গীতগোবিন্দ গান করতেন। (৪২-৫৩)

কেন্দুবিল্ব গ্রামের মকর মেলাতে এই বৈষ্ণবগোষ্ঠী কীর্তন করতেন। তিল সপ্তমীতে এঁরা চন্দ্রভাগা নদীতে আদিত্য ও বিষ্ণুর অর্চনা করে কোনারক মন্দিরে পূজিত হওয়া সূর্যদেবতার প্রসাদ ক্ষীরনাড়ু ভোগ গ্রহণ করতেন। ঐখানে সমুদ্র স্নানের পর নবোদিত সূর্যদর্শনে শ্রীচৈতন্যের মহাভাব প্রকাশিত হোত। এই প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগোষ্ঠী চন্দ্রভাগা থেকে কাকতপুরের মঙ্গলা-দেবীকে দর্শন করে এবং সেখানে কীর্তন সেরে শ্রীক্ষেত্রে ফিরে আসতেন। (৫৪-৬০)

প্রতি বছর দোল পূর্ণিমার সময় এই বৈষ্ণবগোষ্ঠী কটক নগরে গজপতির প্রাসাদে গিয়ে কীর্তন করতেন এবং স্বয়ং গজপতি ও তাঁর রাণীরা ভক্তি সহকারে বৈষ্ণবদের যথোচিত আদরযত্ন করতেন। (৬১-৬৭)

প্রতি বছর এই গোষ্ঠী কটক থেকে চৈত্র মাসে বিরজাক্ষেত্র যাজপুরে যেতেন। সেখানে বৈতরণী নদীতে স্নান সেরে দশাশ্ব-মেধঘাটে বিশ্রাম ও কীর্তন করতেন। শ্রীচৈতন্যের পূর্বপুরুষ যাজনগরের অধিবাসী ছিলেন। মাধব বলেছেন—

তঁহি চলন্তি বিরজাই।   বৈতরণীরে অবগাহি ॥
দশাশ্বমেধ ঘাটে থান।   করন্তি বৈষ্ণবে কীর্তন ॥
প্রভুর পিতৃস্থান এহি।   যাজনগ্রটিএ বোলাই ॥
উপেন্দ্র পিতামহ নাম।   বৎসস সামন্ত কুলীন ॥
(৬৮-৭১)

রাজদত্ত গ্রামে যখন ব্রাহ্মণদের বসতি স্থাপিত হোত তখন এগুলিকে 'শাসন' বলা হোত। প্রতিটি শাসনে কৌলীন্য ও পাণ্ডিত্যের বিচারে কাউকে 'সামন্ত' পদের অধিকারী করা হোত। উপেন্দ্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে মাধব বলেছেন—

ষড়দর্শনে পণ্ডিত।   ন্যায় বেদান্তে সামরথ ॥
কপিলেশ্বর মহারাজা।   অনেক কলাহি তরজা ॥
রাজভয়রে পলাইলে।   শ্রীহঠে যাই বাস কলে ॥
তাহার পুত্র জগন্নাথ।   তা তহুঁ প্রভু হোএ জাত ॥
যাজপুরকু আসি হেলে।   প্রমোদে কীর্তন মণ্ডলে ॥
প্রভুর পরিচয় জানি।   করন্তি পাদ সে বন্দনি ॥
(৭৩-৭৮)

শ্রীচৈতন্য যখন যাজপুর যেতেন তখন গৃহস্থেরা গোময় দিয়ে তাঁদের গৃহের অঙ্গন মার্জনা করে পূর্ণঘট এবং দীপ স্থাপন করে এই মহাপুরুষ আর বৈষ্ণবগোষ্ঠীকে সম্বর্ধনা জানাতেন। শ্রীচৈতন্য যে তাঁদেরই বংশজ এই তথ্য তাঁরা জানতেন এবং শ্রীচৈতন্যকে প্রচুর সম্মান দেখাতেন।

যাজপুর থেকে পুরী আসবার সময় রাস্তায় এঁরা তুলসী ক্ষেত্রে গিয়ে কীর্তন করতেন এবং বলদেবের দর্শন করে প্রসাদ পেতেন। স্নান পূর্ণিমার পূর্বেই এঁরা শ্রীক্ষেত্রে ফিরে আসতেন। প্রত্যেক বছর একই ক্রমে শ্রীচৈতন্য আর পঞ্চসখা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে এইভাবে কীর্তনরস পরিবেশন করতেন। (৭৯-৮৬)

শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক কনকগৌরকান্তি দর্শনে গৃহবাসী মানুষদের দুঃখ দূর হোত। কীর্তনের আসরে তাঁর অঙ্গকান্তি দর্শকদের প্রধান আকর্ষণ ছিল। কীর্তনের সময় অচ্যুতানন্দ রাসলীলা ব্যাখ্যা করতেন। কীর্তনরসের মহামেরু ছিলেন

জগন্নাথদাস। তিনি কীর্তনের একপ্রকার গুরু ছিলেন বলা যায়। কীর্তনের বিষয় নির্বাচন, সুর-তাল নির্ধারণ এ সবই তিনি করতেন। কীর্তনের আসরে সাত্ত্বিকভাবের প্রসার ঘটাতেন বলরামদাস। অনন্ত এবং যশোবন্ত ছিলেন সুগায়ক। শ্রীচৈতন্য পঞ্চসখাকে নিয়ে এইভাবে পুরীতে ও অন্যান্য স্থানে কীর্তন করতেন।

গুরু গদাধর পণ্ডিত ছিলেন পুরীধামে তোটা গোপীনাথের পূজক। তাই পুরী ছেড়ে কীর্তন গাইতে এঁদের সঙ্গে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হোত না। স্বরূপ দামোদরও পুরীতে থাকতেন কিন্তু তিনি তাঁর অসুস্থতার জন্য কীর্তনদলের সঙ্গে বাইরে যেতে পারতেন না। তিনি প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন ও শ্বাসকষ্টে ভুগতেন।

তখন গ্রামে গ্রামে ঐহিক দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি ও জনকল্যাণের জন্য কীর্তন প্রচলিত হয়েছিল। পুত্রহীনেরা বিশ্বাস করতেন কীর্তনের ফলে পুত্র লাভ হয়। ধীরে ধীরে কীর্তন একটি বাধ্যতামূলক সামাজিক অনুষ্ঠান রূপেই পরিগণিত হয়ে উঠেছিল। কীর্তনের আসরে জগন্নাথদাস রচিত ভাগবত একটি আসনের ওপর রেখে তারও পূজো করা হোত। কীর্তনের সময় গীতগোবিন্দ এবং কর্ণামৃতের পদ নৃত্য সহকারে গীত হোত। (জগন্নাথদাস রচিত একটি কীর্তন ড. রথ ও আচার্য সম্পাদিত গ্রন্থে সংযুক্ত হয়েছে। ১০১ সংখ্যক পদের পর এই কীর্তনটি উদ্ধৃত হয়েছে। এটির পংক্তি সংখ্যা এগারো। এরপর পূর্বের রীতিতে মাধবের বর্ণনা আবার ১০২ সংখ্যক শ্লোক থেকে শুরু হয়েছে। তাই বিশ্বাস, এটি মাধবেরই সংগৃহীত পদ।)

একবার অচ্যুতানন্দের এক শিষ্য রামচন্দ্র পুরীতে এসে এই গোষ্ঠীকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল 'ঝঙ্কড়ে' গিয়ে সারলাচণ্ডীর পীঠস্থানে কীর্তন করবার জন্যে। সারলাচণ্ডীর ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য এবং পঞ্চসখা কীর্তন করেছিলেন। এখানে শ্রীচৈতন্যের রাধাভাব উদ্দীপ্ত হয়। স্থানটি সুরম্য এবং একটি পীঠস্থান রূপেই পরিচিত। (৭৯-১১৪)

এইখানে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

নবম অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা একশ' চৌষট্টি। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, রায় রামানন্দ শ্রীমন্দিরের দেখাশোনার ভার পেয়ে শ্রীক্ষেত্রে আসার পর শ্রীমন্দিরের উত্তর পাশে একটি মণ্ডপ নির্মাণ করান। এখানেই বৈষ্ণবেরা একত্রিত হতেন। এখানে রায় রামানন্দের স্থানই ছিল মুখ্য। এই গোষ্ঠীতে অবশ্যই শ্রীচৈতন্য সহ পঞ্চসখা উপস্থিত থাকতেন। স্বরূপ দামোদর, রঘুনাথ দাস প্রমুখ বৈষ্ণবেরাও এখানে প্রত্যহ একত্রিত হতেন। বাসুদেব সার্বভৌমও মাঝে মাঝে এই ইষ্টগোষ্ঠীতে এসে বসতেন এবং শাস্ত্র বিচারে অংশগ্রহণ করতেন।

১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে রূপ বৃন্দাবন থেকে পুরীধামে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর রচিত একটি নাটক দেখালেন। মহাপ্রভু সেটি দেখে—

প্রভু সে রাম রায়ে দেলে। পরীক্ষা করহো বোইলে ॥
রায় বোইলে পড় শ্লোক। কবিত্ব পরিমানিবাক ॥
রূপ পড়ই শ্লোক যেতে। নান্দীরু রাধানাম সর্গান্তে ॥
রাম বোইলে রূপে চাহিঁ। কবিত্ব তোর অমৃতহি ॥
এড়েক রস নাট কলু। কবিতা রস আস্বাদিলু ॥
তোর নাটক যে বিশেষ। প্রকাশ হেউ সর্বদেশ ॥
বিদগ্ধ মাধব এ নাট। লোকরে হেলাটি প্রকট ॥ (৯-১৫)

নীলাচলের পণ্ডিতদের দ্বারা স্বীকৃত না হলে ওড়িষ্যায় কোন কাব্যকৃতি প্রচারিত হবার সুযোগ পেতো না। রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধ মাধব' ইষ্টগোষ্ঠীতে প্রশংসিত হয় এবং প্রচারিত হয়। রূপ গোস্বামী ঐ ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে এসেছিলেন রথযাত্রার সময় আর প্রায় দু'মাস ছিলেন। কার্তিক মাসের শুরুতে তিনি বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করলেন। এইবার রঘুনাথদাস গোস্বামী রূপ গোস্বামীর সঙ্গে বৃন্দাবন চলে গেলেন। (১৬-১৮)

নীলাচলে কাশী মিশ্রের বাড়িতেই শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে স্বরূপ দামোদর থাকতেন। মাঘ শুক্লা একাদশীতে কাশী মিশ্রের গম্ভীরাতে তাঁর দেহান্ত হয়। (এটি সম্ভবত ১৫৩৩। ফেব্রুয়ারী মাস।) শ্রীচৈতন্যের আদেশে সকলে স্বরূপের মরদেহ সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে আসেন এবং তারপর তাঁরই আদেশে

তোটা গোপীনাথের পূজক গদাধর পণ্ডিত গৌড়ে গিয়ে স্বরূপের দেহান্ত হওয়ার সংবাদ দিলেন। (এরপর গদাধর পণ্ডিত নীলাচল ফিরে এসেছিলেন কিনা তার কোন উল্লেখ নেই।) (১৬-২৭)

বলরাম ছিলেন সুপণ্ডিত এবং বেদান্তবিদ। তিনি 'বেদান্তসার রুদ্রগীতা' রচনা করেন। তিনি রামায়ণও রচনা করেন। (এটি 'জগমোহন রামায়ণ' নামে পরিচিত ও দাণ্ডীবৃত্তে রচিত।) তিনি সর্বদা নাম সংকীর্তনে রত থাকতেন। এই সময় তিনি অনুভব করেন যে তাঁর দেহত্যাগের সময় হয়ে এসেছে। তিনি মৌন অবলম্বন করলেন এবং প্রায় একই সঙ্গে অন্নগ্রহণও ত্যাগ করলেন। ফাল্গুন শুক্লা দশমীর দিন (১৫৩৩/২৬শে মার্চ) তিনি দেহত্যাগ করলেন। তাঁর মরদেহ সমুদ্রতটে সমাধিস্থ করা হোল। (২৮-৪২)

শ্রীচৈতন্য ছিলেন পুণ্যদেহের অধিকারী। কিন্তু এই সময় থেকে ধীরে ধীরে তাঁর শরীরও ক্ষয় পেতে থাকে। তখনো কিন্তু খোল করতাল নিয়ে কীর্তন ও মহাপ্রভুর উদ্দাম নৃত্য অব্যাহত ছিল। কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমানতালে পদক্ষেপণ ও নৃত্য করেই চলতেন। এমনি এক সময়—

বাটে ইটাএ পড়িথিলা। তাঁহিকি দৃষ্টি তা ন থিলা ॥
বাজিলা বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি। রুধির ঝরই নিকিটি ॥
পদখঞ্জাই মোড়ি হেলা। গলবাজি তলে পড়িলা ॥
স্বামী যে কাশীশ্বর মিশ্র। যশোবন্ত শ্রীবৎস অনন্ত ॥
সর্বে হোইন এক মেল। প্রভুকু সম্ভালে ভূতল ॥
প্রভু সে হতজ্ঞান হোই। তলে পড়িছি চেতা নাহি ॥
প্রভুঙ্কু কান্ধে টেকি নেলে। রুক্মিণী অমাবস্যা সায়ংকালে ॥
উত্তর পারুশ মণ্ডপে। শুআই দেলে চিতা টোপে ॥
নাসারু অনিল বহই। চক্ষু মুজিন পড়ি যাই ॥
মুখেন সলিল সিঞ্চন। কেতে বেলেকে উদে জ্ঞান ॥

(৪৬-৫৫)

—উদ্দাম নৃত্য করে চলেছেন শ্রীচৈতন্য। পথে ইষ্টকখণ্ড একটি পড়েছিল, সেটির দিকে কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ছিল না। বাম

পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে তিনি আঘাত পেলেন এবং ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হোল। তিনি পা মুড়ে পড়ে গেলেন এবং তাঁর কণ্ঠ থেকে গভীর কাতরোক্তি শোনা গেল। জগন্নাথ দাস, কাশী মিশ্র, যশোবন্ত দাস, শ্রীবৎস* এবং অনন্ত দাস সকলে একত্রিত হয়ে ভূপতিত প্রভুকে সামলানোর চেষ্টা করেন। প্রভু জ্ঞান হারিয়েছিলেন। অজ্ঞান হয়েই তিনি মাটিতে পড়েছিলেন। সেই রুক্মিণী অমাবস্যার (অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্ববর্তী অমাবস্যা) দিন সন্ধ্যায় সঙ্গীরা অজ্ঞান প্রভুকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে উত্তর পাশের মণ্ডপে চিত করে শুইয়ে দিলেন। তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস ঠিক ছিল কিন্তু অচেতন অবস্থায় তিনি চক্ষু মুদ্রিত করে পড়েছিলেন। সকলে জল এনে তাঁর মুখে সিঞ্চন করতে থাকলেন এবং কিছুক্ষণ পরে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো।

চেতনা ফিরে পাওয়ার পর তিনি চোখ মেলে চাইলেন এবং সমবেত সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। জগন্নাথ দাস প্রভুর মুখের কাছে সরে এসে তাঁকে কথা বলতে অনুরোধ জানালেন কিন্তু তখনো তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। সন্ধ্যার পর জগন্নাথ দাস ছাড়া অন্য সকলে চলে গেলেন কিন্তু সংবাদ পেয়ে রায় রামানন্দ এসে পৌঁছলেন। ততক্ষণে শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যারতির সময় হয়ে গিয়েছে। খোল করতাল ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের গম্ভীর শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

প্রভু বললেন, 'আমাকে নিয়ে চল, আমি শ্রীজগন্নাথদেবের সামনে ভক্তদের নৃত্য একটু দেখে আসবো।' কিন্তু মাটিতে পা পড়ছিল না। জগন্নাথ তাঁকে ধরে বসালেন আর বললেন, 'তুমি যাবার ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। বরং এখানে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাক। তোমার পায়ে গভীর ক্ষত হয়েছে, একহাত পরিমিত স্থানও তোমার পক্ষে এখন হাঁটা সম্ভব নয়। তোমার পান-ভোজনের ব্যবস্থা আমি এখানেই করবো এবং সারাক্ষণ তোমার কাছেই থাকবো।' (৫৬-৬৬)

রাত্রি প্রভাত হোল। তখন শ্রীচৈতন্যের শরীরে প্রবল উত্তাপ দেখা গেল। মনে হতে লাগল যে শরীরে ধান ছড়িয়ে দিলে খৈ

* সম্ভবত কোন উৎকলীয় ভক্ত।

হয়ে যাবে। সারাদিন জ্বরভোগের পর সন্ধ্যার দিকে তাঁর পা ফুলে গেল। সেই সঙ্গে বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিটির যন্ত্রণা বর্ধিত হোল। জগন্নাথ একটু জল গরম করে নিয়ে এলেন আর তাতেই শ্রীচৈতন্যের বাম পায়ের পাতাটি ডুবিয়ে রাখলেন। জগন্নাথ প্রশ্ন করলেন, 'জল কি বেশি গরম ঠেকছে?' মনে হয় জল বেশি গরম ছিল। আর একটু ঠাণ্ডা করার পর সেই জলে পা ডোবালেন। তাতে জগন্নাথদেবের মনে হোল, শ্রীচৈতন্য কিঞ্চিৎ আরামবোধ করছেন। কিন্তু শরীরের জ্বর কমছিল না। রাতে প্রবল কম্পন উপস্থিত হোল।

জগন্নাথ শ্রীচৈতন্যের পাশেই বসেছিলেন। তিনি জগন্নাথকে বললেন, 'তুমি আমার কাছ থেকে যেও না। তুমি থাকলে আমার কষ্টের অনেকখানি লাঘব হবে। শ্রীহরির ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তুমি শ্রীজগন্নাথদেবের অন্যতম প্রধান সেবক। আমি তোমার সেব পাচ্ছি, আর আমার কি চাই! তিনি হয়তো আমার এই দৈহিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে আমাকে তাঁর 'নিজধামে'ই টেনে নেবেন।'

এরপর সঙ্গী জগন্নাথ দাস যে পরম ভক্তিমান এবং ভক্তিমার্গের পথিক, একথা বলতে বলতে শ্রীচৈতন্যের চোখ থেকে জলের ধারা নাবলো। সাধ্বী নারী যেভাবে স্বামীর সেবা করেন, জগন্নাথ তেমনি যত্ন ও শ্রদ্ধা নিয়ে শ্রীচৈতন্যের সেবা করতে থাকলেন। কিন্তু কোন উপায়েই দেহের উত্তাপ কমলো না। ধীরে ধীরে শ্রীচৈতন্যের সর্বাঙ্গ ফুলে গেল। এরপর মাধবের বর্ণনায়—

অক্ষয় তৃতীয়া প্রবেশ। চন্দন যাত অবকাশ ॥
ব্রাহ্ম মুহূর্তে আসি হেলা। প্রভুর পিণ্ডু প্রাণ গলা ॥
একা সে জগন্নাথ দাস। মন্দিরে অছি তার পাশ ॥ (৮৯-৯১)

জগন্নাথ দাস ক্রন্দনরত অবস্থায় শ্রীচৈতন্যের মরদেহের কাছে বসে রইলেন। ভোর হোল, দু'একজন সেবক উপস্থিত হলেন। তাদের একজনকে জগন্নাথ দাস বললেন, 'এই মুহূর্তে দৌড়ে যাও

---

* এই অক্ষয় তৃতীয়া হোল ১৪৫৫ শকাব্দের, ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল রবিবার। এল. ডি. এস. পিল্লাই সম্পাদিত 'অ্যান ইন্ডিয়ান এফিমারিজ', ৫ম খণ্ড, মাদ্রাজ, ১৯২২, পৃ. ২৬৮।

আর রায় রামানন্দকে খবর দাও—তিনি যেন এখনি এখানে চলে আসেন। খবর পেয়ে রাম রায় দ্রুতবেগে মন্দিরে উপস্থিত হলেন এবং অবস্থা দেখে তাঁর দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা বইল। তিনি পরম যত্নে আর শ্রদ্ধায় শ্রীচৈতন্যের মুখমণ্ডলে আর সর্বাঙ্গে হাত বুলোতে লাগলেন। বুঝলেন, সব শেষ হয়ে গেছে।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন আর উপস্থিত সেবকদের আদেশ করলেন—

আজ দুআর কিলা হেব। দেবতা নীতি ন চলিব ॥
হকারি অশ্বারোহী জনে। চিটাউ প্রেরিল তক্ষণে ॥
যোগরে সময় তৃতীয়া। চন্দন যাত্রা বিনোদিয়া ॥
গজপতি সে রুদ্রদেব। বিজে দর্শনকু সম্ভব ॥
বাটরে ভেটি অশ্বারোহী। চিটাউ পড়িলা ফিটাই ॥

(১০৬-১০)

—রাম রায়ের আদেশ হোল, 'আজ মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকবে এবং দেবতার সমস্ত সেবাপূজা বা 'নীতি'ও বন্ধ থাকবে।' এরপর তিনি একজন অশ্বারোহীকে ডাকিয়ে তার হাতে রাজার নামে একটি পত্র প্রেরণ করলেন। সেদিন অক্ষয় তৃতীয়া, চন্দন যাত্রার শুভদিন। এ খুবই সম্ভব যে গজপতি রুদ্রদেব চন্দন যাত্রা দর্শনের জন্য আসছেন। (সম্ভবত তিনি কটক রাজপ্রাসাদেই ছিলেন ঐ সময়।) রাম রায়ের অনুমান ছিল অভ্রান্ত। পথেই রাজার সঙ্গে অশ্বারোহীর সাক্ষাৎ হলো। রাজা চিঠি খুলে পড়লেন আর তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি সোজা মন্দিরে এসে সবকিছু দেখলেন আর শুনলেন। ইতিমধ্যে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হয়েছে, এরপর—

রাম রায় সে জানাইলে। প্রভুকু কি করিবা বোলে ॥
গজপতি যে দারুভূত। কথা ন স্ফুরে মুখুঁ সত ॥
রাম রায় সে বলে শুন। এ শব নেলে অকারণ ॥
গোড়ীয় কদর্থ করিবে। ম্লেচ্ছ রাজারে খর বোলিবে ॥
লাগিব কন্দোল বহুত। শুন্য কথাকু মিছ সত ॥
যোড়িবে অনেক বারতা। শেষে পাইবু অপনিন্দা ॥
মন্দিরে মরা গলা প্রভু। এহাকু এথে পোতাইবু ॥
মণিমা রথ যাত বেলে। প্রভু বোলিহি যাত্রী মেলে ॥

এ প্রভু সে প্রভুরে লীন। হেলা বোলিবাটি কারণ ॥
শব পোতাইবা তুরিতে। কোইলী বৈকুণ্ঠ পুরীতে ॥
জগন্নাথ জীর্ণ বিগ্রহ। পোতা হেলা ঠারু এ নীত ॥
গজপতি যে অধোমুখে। সম্মত হেলেক তুরিতে ॥
কোইলী বৈকুণ্ঠে শব নেই। পোতাইলে গাত খোলাই ॥
রাম রায় যে স্বামীপদে। আউ সেবক দুই এক ॥
এহা ন জানে আন কেহি। পড়িলা দুআর ফিটাই ॥ (১১২-২৬)

—রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের মরদেহ নিয়ে কি করা কর্তব্য, সে সম্পর্কে রাজাকে প্রশ্ন করলেন কিন্তু রাজা দুঃখে প্রায় চেতনা-হীন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মুখ থেকে কোন কথাই বেরুলো না। তখন রামানন্দই বললেন, 'এই শবদেহ মন্দিরের বাইরে নেওয়ার কোন যুক্তি নেই। গৌড়ীয় ভক্তরা শুনলে এর অনেক নিন্দা প্রচার করবেন, হয়তো মুসলমান রাজাকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবেন। যার মধ্যে সার বস্তু কিন্তু নেই তার সঙ্গে সত্য-মিথ্যা নানা কথা যুক্ত হয়ে বিবাদ উপস্থিত হবে। এতে আমরাই নিন্দিত হবো। যেহেতু প্রভু মন্দিরেই দেহত্যাগ করেছেন, এঁর মরদেহ এখানেই সমাধিস্থ করবো। পরে যখন শ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা আসবে তখন যাত্রীরা অবশ্যই প্রভুর খোঁজ করবে। তখনট তাঁদের জানানো হবে যে এ প্রভু ঐ প্রভুর দেহেই লীন হয়ে গিয়েছেন। এখন তাড়াতাড়ি কোইলী বৈকুণ্ঠে এই মরদেহ সমাধিস্থ করবো। ওখানেই জগন্নাথ দেবের জীর্ণ দারুমূর্তি সমাধিস্থ করার নীতি প্রতিপালিত হয়ে আসছে*।' গজপতি

---

* 'কোইলী বৈকুণ্ঠে'র অপর নাম 'কৈবল্য বৈকুণ্ঠ'। নবকলেবরের বছর পুরনো বিগ্রহ তিনটির দেহ থেকে 'ব্রহ্ম পদার্থ' বার করে নিয়ে নতুন তিনটি বিগ্রহে স্থাপন করার পর 'ব্রহ্ম পদার্থ' হীন মূর্তিগুলিকে ৬ হাত চওড়া ও ৯ হাত গভীর একটি গর্ত খনন করে তার মধ্যে সমাহিত করা হয়। সেই মূর্তিগুলির সঙ্গে রথের ওপর ব্যবহৃত পার্শ্বদেবতা, অপ্সরা ও অশ্বমূর্তি-গুলিকেও সমাহিত করা হয়। প্রতি বছর রথযাত্রার পর শুধু এই মূর্তি-গুলিই রক্ষিত হয়; রথের বাকি সমস্তটাই খুলে বেচে দেওয়া হয়। পার্শ্ব-দেবতা, অপ্সরা এবং অশ্বমূর্তিগুলি 'নবকলেবর অনুষ্ঠান' পর্যন্ত প্রতি বছর রথের ওপর ব্যবহার করা হয় আর দারুবিগ্রহ নতুন করে তৈরী করার সময় এগুলিও নতুন করে তৈরী করে নেওয়া হয়।

প্রতাপরুদ্রদেব অধোমুখে তাঁর সম্মতি জানালেন। শবদেহ কোইলী বৈকুণ্ঠে বহন করে নিয়ে গিয়ে সেবকদের দ্বারা নির্মিত একটি খাদের মধ্যে সমাহিত করা হোল। জগন্নাথ দাস, রামানন্দ আর কয়েকজন সেবক ছাড়া এ কথা আর কেউ জানলেন না। রাজাদেশ ঘোষিত হোল—'এ কথা যেন আর কেউ জানতে না পারে।' এরপর মন্দিরের প্রধান দরজা খুলে দেওয়া হোল।

নিয়ম মতো শ্রীমন্দির সংস্কারের আদেশ দেওয়া হোল। সব মন্দির জল ঢেলে ধোওয়া হোল আর সেবকেরা সর্বত্র কর্পূর চন্দন আর অগুরু ছড়িয়ে দিলেন। এর কিছু পরে 'চন্দনলাগি' বা দেব বিগ্রহগুলিকে চন্দনচর্চিত করে চন্দন যাত্রার আয়োজন শুরু হোল। ভক্ত যাঁরা উপস্থিত হলেন তাঁরা শুনলেন শ্রীচৈতন্য দারুবিগ্রহে লীন হয়ে গিয়েছেন। চন্দনযাত্রার মহান আনন্দের দিনেও সকলের মুখে বিষাদের ছায়া নেবে এলো। কারো মুখেই আনন্দের স্পর্শ রইলো না। বিদ্যুৎ যেভাবে মেঘের মধ্যেই অন্তর্হিত হয়, শ্রীচৈতন্য ঠিক সেইভাবেই শ্রীজগন্নাথের দেহে লীন হয়ে গিয়েছেন—এই কথা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়লো। সকলেই সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে দুঃখ ভোগ করতে লাগলেন।

(১২৭-৩৫)

তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবান এবং কীর্তনানন্দে নৃত্য করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এখন তিনি শ্রীঅঙ্গেই মিশে গেলেন। পঞ্চসখার বাকী তিনজন (অনন্ত, অচ্যুত, যশোবন্ত) জগন্নাথ দাসের গলা জড়িয়ে কাঁদতে থাকলেন। অচ্যুত জগন্নাথ দাসকে বললেন, 'তুমিই বা তাঁকে ছেড়ে দিলে কেন; তাঁকে তুমি বন্দী করে রেখে দিতে পারলে না?' যশোবন্ত অচ্যুতকে বললেন, 'বালকের মতো এ সব কথা আর বলে কিছু লাভ নেই।' এদিকে শিশু-অনন্ত শিশুর মতোই কেঁদে চলেছেন। এঁরা দিনরাত্রি শুধু শ্রীচৈতন্যের বিষয়ই আলোচনা করতে থাকলেন। (১৩৬-৪৪)

রথযাত্রা উপস্থিত হোল। গৌড়ীয় ভক্তরা নীলাচলে রথযাত্রা দর্শনে এলেন। রথের ওপর থেকে গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব শ্রীচৈতন্যদেবের দারুবিগ্রহে লীন হয়ে যাবার কথা ঘোষণা করলেন। সকলেই এই শোকদায়ক সংবাদ জানলেন। রথের

সামনে নৃত্যরত শ্রীচৈতন্যের অভাব অনুভব করে রাজা এতোই বিচলিত হলেন যে 'ছেরা পহরার' সময় তাঁর হাত থেকে স্বর্ণ সম্মার্জনী পড়ে গেল।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হোল না। সকলেই বিরস মনে দিন যাপন করতে শুরু করলেন। উত্তরপাশের মণ্ডপে রাম রায় এসে বসেন, শ্রীচৈতন্যের কথা স্মরণ করেন এবং তাঁর দু'চোখ থেকে জলের ধারা নেবে আসে। যখন জগন্নাথ দাস এসে উপস্থিত হন তখনই স্তব্ধ হয়ে যাওয়া কীর্তনের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। জগন্নাথ দাস ঘোষণা করলেন 'আমি আর শ্রীমন্দিরে আসবো না। আমি সমুদ্রের কূলেই বাকী জীবন অতিবাহিত করবো।' অনন্ত, অচ্যুত এঁরা নিজেদের স্থানে ফিরে চলে গেলেন।

সেইদিন সন্ধ্যায় রাম রায়ও দেহত্যাগ করলেন। 'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' উচ্চারণ করতে করতে তাঁর মরদেহ থেকে আত্মা চলে গেল। সমগ্র শ্রীক্ষেত্রে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল কোলাহল শ্রুত হোল। সকলেই 'হরিনাম' এবং 'রামনামই সত্য' —উচ্চারণ করতে থাকলেন। প্রাণীর মৃত্যু কীভাবে হচ্ছে তা দেখে তাঁর জীবন ভাল কি মন্দ ছিল, তা বলা যায়—একথা জগন্নাথ দাসই বলেছেন। তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁর কথা এদিক ওদিক হবার নয়। (১৪৫-৬৪)

এইখানে মাধব পট্টনায়কের 'বৈষ্ণব লীলামৃত'খানি শেষ হয়েছে। তাঁর রচিত শ্লোক সংখ্যা, শিক্ষাষ্টকের অনুবাদ ছেড়ে দিয়েও দাঁড়িয়েছে মোট বারোশ' সাত-এ। তাই বলা যায় পুঁথিটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। এটি 'চৈতন্য বিলাসে'র চাইতে বড় অবশ্যই। কবি মাধব পট্টনায়ক ১৫৩৫ সালে এই 'বৈষ্ণব লীলামৃত' রচনা করেছেন। এর প্রায় দু' বছর আগে দেহত্যাগ করেছেন তাঁর আশ্রয়দাতা ও শিক্ষাগুরু রায় রামানন্দ। যে কাহিনী গোপন রাখার আদেশ তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন, সত্য ঘটনা প্রকাশের আন্তরিক তাগাদায় মাধব তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আমরা আগেই হিসেব করে দেখেছি যে এই পুঁথি রচনার সময় তাঁর বয়স প্রায় ষাট বছর হয়েছিল। শোকক্লিষ্ট এই পরম বৈষ্ণব

এবং কবি-প্রতিভার অধিকারী মানুষটিও বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁরও চলে যাবার দিন দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। আর হয়তো এই অনুভূতিই তাঁকে তাঁর আশ্রয়দাতা এবং শিক্ষাদাতা প্রয়াত রায় রামানন্দের নির্দেশ অমান্য করেও সত্যান্বিত তথ্যগুলি ভবিষ্যতের পাঠকদের জন্য লিপিবন্ধ করে যাবার প্রেরণা যুগিয়েছিল। সত্যের নিরাভরণ প্রকাশ ও নিষ্ঠা দৃঢ় নৈতিক চরিত্রের পরিচায়ক। মাধবের পুঁথির মধ্যে কোথাও তার অভাব ঘটেনি। জগন্নাথ দাসের প্রতি তাঁর যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল তা পুঁথিটির ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিই ছিলেন। আপন প্রদেশের এই পরম বৈষ্ণব কবির প্রতি যদি কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি পক্ষ-পাতিত্ব দেখিয়েও থাকেন, তা দোষাবহ নয়।

॥ ৬ ॥

মাধবের 'চৈতন্য বিলাস' রচিত হয়েছিল ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু তার অনুলিপিগুলি যেভাবে আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে তাতে তাঁর স্বীয় ভাষাভঙ্গি অনেকখানিই নষ্ট হয়ে গেছে। যে কোন পাঠক 'চৈতন্য বিলাস' এবং ১৫৩৫ সালে রচিত 'বৈষ্ণব লীলামৃতে'র ভাষা মিলিয়ে দেখলে ভাষাগত পার্থক্যটি সহজেই বুঝতে পারবেন। এর জন্য অতি অবশ্যই দু'খানি পুঁথি ওড়িয়া ভাষাতেই পাঠ করার প্রয়োজন আছে।

মাধব যখন তাঁর কাব্যগুলি রচনা করেছেন তার বহু আগেই ওড়িয়া ভাষা তার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মূলত সারলা দাস আর পঞ্চসখার কবিকৃতিগুলির সাহায্যে। সারলা দাসের 'মহাভারত', বলরাম দাসের 'জগমোহন রামায়ণ', জগন্নাথ দাসের 'ভাগবত' এই তিনখানি বৃহৎ গ্রন্থ তখন ওড়িষ্যার পাঠক সম্প্রদায়কে নতুন ভাষাভঙ্গির আস্বাদ দিয়েছে। এই ভাষাভঙ্গির সঙ্গে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষার তেমন কিছু বড় পার্থক্য ছিল না। এ যেন অন্তরের সুখ দুঃখ প্রকাশের সরল-তরল ভাষা যা অত্যন্ত সহজভাবেই হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়, কোন প্রয়াসের অপেক্ষা রাখে না। এঁরা সকলেই সেই দৈনন্দিন জীবনের বহু পরিচিত ভাষা রীতিটিকেই তুলে এনেছিলেন সমকালীন সমাজ

থেকে। কাব্যে ওড়িয়া ভাষার প্রাকৃত রূপটি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত যখন মাধব চৈতন্য জীবনী রচনায় প্রয়াসী হন।

মাধব সংস্কৃত জানতেন তার প্রমাণ যেমনি 'চৈতন্য বিলাস' পুঁথির মধ্যে পাওয়া যায় তেমনি পাওয়া যায় তাঁর সঙ্গীত শাস্ত্রে পারদর্শিতার প্রমাণ। 'চৈতন্য বিলাসে'র প্রতিটি ছন্দের শিরোদেশে রাগ-রাগিণীর উল্লেখসহ কীভাবে তা গাইতে হবে তারও সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে।

মাধবের 'বৈষ্ণবলীলামৃত' পুঁথিখানির যে তিনটি অনুলিপি সম্পাদকেরা সংগ্রহ করে একটি শুদ্ধ পাঠ খাড়া করেছেন তাতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন পদের সঙ্গে 'টি' বর্ণের যোগ অজস্র। অথচ এটি 'চৈতন্য বিলাসে' একেবারেই অনুপস্থিত। এর দুটো কারণ অনুমান করা যায়, হয়তো বা 'বৈষ্ণব লীলামৃত' রচনায় জগন্নাথ দাস অনুসৃত নবাক্ষরী ছন্দের মাত্রাসংখ্যা ঠিক রাখতে গিয়ে এই বর্ণটির অতিরিক্ত ব্যবহার প্রয়োজন হয়েছিল, নয়তো বা প্রায় বিশ বছর পরে মাধব যখন এই কাব্যটি লিখছেন তখন তাঁর ভাষা রীতির মধ্যে এটি প্রায় মুদ্রাদোষের মতোই এসে পড়েছিল। অথচ দ্বিতীয় কাব্যখানির বহুক্ষেত্রেই অন্ত্যানুপ্রাস রক্ষিত হয়নি। 'চৈতন্য বিলাস' গীতোদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল, দ্বিতীয় রচনাটি একান্তই পাঠ্য, গেয় নয়। যাই হোক 'চৈতন্যবিলাসে' -টি বর্ণযুক্ত শব্দের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে দ্বিতীয় অনুমানের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কথ্য ওড়িয়া ভাষায় শব্দের শেষে '-টি'র ব্যবহার এখনো যথেষ্ট পরিমাণে শোনা যায়।

দ্বিতীয় পুঁথিতে 'হকারি', 'উভারি', 'পরিমানিবাবা' প্রভৃতি ই প্রত্যয়ান্ত ধাতুও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার সঙ্গে আছে 'লেখিতে', 'কহিতে', 'ধরিতে' প্রভৃতি উত্তর-ওড়িষ্যায় বাংলা প্রভাবিত শব্দের বেশ কিছু প্রয়োগ। অন্যদিকে 'লিহিবি' যখন চোখে পড়ে তখন এই সন্দেহ প্রবল হয়ে ওঠে যে এর পরিবর্তে 'লেখিবি' শব্দটি পরবর্তীকালের লিপকর-প্রযুক্ত। প্রায় পাঁচশ' বছর আগেকার রচনা রচয়িতার মূল ভাষাভঙ্গি নিয়ে আমাদের কাছে এসে পেঁাছবে এ আশা বাতুলতা। অনুলিপির অনুলিপি তৈরী হতে হতে আমাদের হাতে যে পুঁথি আসে, তার বয়স বেশি

হলে দু'শ বছর। বহু অনুলিপি প্রস্তুতকারক তাঁর নকল করার সাল তারিখ দেন, অনেকে দেন না। পুঁথির কালি আর লিপির ছাঁদ দেখে পুঁথির প্রাচীনত্ব যাচাই করা যায়। এ সব পুঁথিই তাল-পাতার কিন্তু সযত্নে রক্ষিত হয় না প্রায় ক্ষেত্রেই। তাই ৭০।৭৫ বছরের পুঁথিও জীর্ণ অবস্থায় দেখেছি আবার দেড়শ' দু'শ বছরের পুরনো পুঁথিকেও ভালো অবস্থায় পেয়েছি।

মাধবের দু'টি পুঁথি সম্পর্কে আলোচনায় এগুলির ভাষা রীতি বা সাহিত্যমূল্য বিচার আমাদের উদ্দিষ্ট নয়। তবু সাধারণ-ভাবে ভাষা সম্পর্কে যেমনি দু'একটি কথা বলেছি তেমনি কাব্য-মূল্য সম্পর্কেও সংক্ষেপে কিছু বলা কর্তব্য। অলঙ্কার রচনাকে কাব্যমূল্য দেয়—এই প্রাচীন রীতির মানদণ্ডে মাধবের দু'খানি রচনাই কাব্য। উপমা-রূপকের প্রচুর প্রয়োগ কাব্য দু'টিকে সুখ-পাঠ্য অবশ্যই করে তুলেছে। সাধারণভাবে 'চৈতন্য বিলাস' বিষাদাত্মক রচনা। সন্ন্যাস নেবার কথা এবং সন্ন্যাস গ্রহণের পর শচী এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ আর সেই সঙ্গে নদীয়ার বন্ধুবর্গ ও অন্যান্য নরনারীর শোকবর্ণনা 'চৈতন্যবিলাস'কে অশ্রুভারাক্রান্ত করে রেখেছে। শচী যেখানে আপন দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে বিলাপ করছেন সেখানে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ শুধু তাঁর নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করেই নয়—বিশ্বম্ভরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কথাও তিনি স্মরণ করছেন। তাই তাঁর বিলাপোক্তির সঙ্গে ভর্ৎসনার মিশ্রণটি বড় মনোরম। তিনি বলছেন—

শিশু কালরু যাহাঙ্ক তুলে।
খেলুথাঅ নানা কুতূহলে॥
সে সখা মানঙ্কু দয়া না বসিলা।
এহু কোমল হৃদি কমলে হে
সুন্দর ॥ ২০ ॥
নদী আর নরনারী শিরে।
বজ্র পকাই থিব হেলারে॥
কেত পৌরুষ লভিব জগতে।
এহি শিক্ষা কে দেলা তুম্ভরে হে
সুন্দর ॥ ২১ ॥ (চতুর্থ ছান্দ)

—শৈশব থেকে যারা তোমার খেলার সঙ্গী ছিল তাদের প্রতি তোমার এই কোমল হৃদয়ে এতোটুকুও দয়ার উদ্রেক হোল না? নদীয়ার সমগ্র নরনারীর মাথায় বজ্রাঘাত করে তোমার যথেষ্ট পৌরুষ প্রমাণিত হবে—এই শিক্ষাই বা তোমাকে কে দিল?

বিষ্ণুপ্রিয়ার এসব ভর্ৎসনাযুক্ত বিলাপের উত্তরে বিশ্বম্ভর যে গূঢ় দর্শনের কথা শুনিয়েছেন তা যেন বড় নীরস ঠেকে, অর্থহীন মনে হয়। এই পৃথিবীর সবই মায়া, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের ভজনই সারবস্তু—এই পরিবেশে বিশ্বম্ভরের এসব উক্তি যেন নিরর্থক আর বড় অন্তঃসারশূন্য মনে হয়।

নানা ছন্দে রচিত 'চৈতন্যবিলাস' গেয় কাব্য হিসেবে তার উৎকর্ষের প্রমাণ অভ্রান্তভাবেই রেখেছে। অন্যদিকে পাঠ্য-কাব্য 'বৈষ্ণব লীলামৃত' আগাগোড়া নবাক্ষরী পয়ারে রচিত—

প্রভু সঙ্গত/গৌড়িআএ।
সকল চই/-তন্য নোহে॥
সকল মৃগ/-র নাভিরে।
কস্তূরী ন থা/-ইটি ভলে॥
সকল অর/-ন্যে চন্দন।
ন থাই জান/কদাচন॥
সকল গৌড়ী/-আ বৈষ্ণব।
নোহন্তি প্রভু/-র স্বরূপ॥

দুটি পুঁথির বিষয়বস্তুর দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থেকেছে তবু ভাষাভঙ্গি বা রচনাশৈলী আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে, একথা ঠিক নয়। যেমন বলেছি—টি প্রত্যয়ান্ত শব্দ চৈতন্যবিলাসে নেই তেমনি বলি 'পার্শ্বে' অর্থে 'পারুশে' শব্দ দু'টি কাব্যেই বহু ব্যবহৃত।

চৈতন্য চরিতকাব্যগুলির প্রায় সবই ভক্তিরসাশ্রিত রচনা বা তত্ত্বাশ্রয়ী রচনা। ঐতিহাসিকতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশ এইসব গ্রন্থ রচয়িতার ছিল না। তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল শ্রীচৈতন্য যে কৃষ্ণাবতার—এই একটি সিদ্ধান্তকেই প্রতিষ্ঠিত করার দিকে। এই কাজটি করতে গিয়ে অবতার শ্রীচৈতন্যের আড়ালে মহামানব শ্রীচৈতন্য প্রায় সবটুকুই ঢাকা পড়ে

গেছেন। সমকালীন পূর্বভারতে যে বিরাট সামাজিক বিপ্লবের অভ্যুত্থান তিনি ঘটিয়েছিলেন, তার বিশদ বিবরণ এঁরা দেননি কিন্তু যাঁরা বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনে অভিজ্ঞ, যাঁদের দৃষ্টি সমালোচকের, তাঁরা ঐ সব রচনার ভেতর থেকেই পূর্বভারতে প্রথম নবজাগরণের মূর্ত প্রতীক শ্রীচৈতন্যকে ঠিকই আবিষ্কার করতে পারেন। একালে সেই দৃষ্টি দিয়েই শ্রীচৈতন্যের জীবন ও জীবনাচরণ আলোচিত হচ্ছে—এটিই আশার কথা। শ্রদ্ধা বা ভক্তিহীন জ্ঞান যেমনি শুষ্ক, তেমনি জ্ঞানহীন ভক্তি শুধুই বাষ্প। এর কোন একটি গ্রাহ্য নয়, গ্রাহ্য দু'এর সার্থক সমন্বয়। কোন একটি দিক আর একটি দিককে আচ্ছন্ন করবে না—এটিই এযুগে কাম্য। এই মহামানবের পঞ্চশত আবির্ভাব-তিথি পালন শুরু হয়েছে প্রায় তিন বছর আগে। এর মধ্যে যেমনি মধ্যযুগের চৈতন্যচরিতগ্রন্থ কয়েকখানি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, শ্রীচৈতন্য-জীবন অবলম্বনে বেশ কিছু প্রবন্ধ-সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। এখন চরিতগ্রন্থগুলি যাঁরা সম্পাদনা করছেন তাঁরা সকলেই শুদ্ধ 'বৈষ্ণব' নন, বৈষ্ণবীয় ধ্যানধারণার প্রতি শ্রদ্ধাবান গবেষক। তাঁদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে তাই কিছু নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হচ্ছে। একই কথা প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থগুলি সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

প্রচুর 'বিভূতি' বা ভস্মলিপ্ত দেহ যেমন সন্ন্যাসীর প্রকৃত অঙ্গ কান্তিকে দৃষ্টির অন্তরালে রেখে দেয়, ভক্তির আতিশয্যও তেমনি শ্রীচৈতন্যের মানবিক এবং বৈপ্লবিক সমাজবাদীর রূপটিকে এতোকাল সাধারণ পাঠকের দৃষ্টির অন্তরালে রেখে দিয়েছিল। সৌভাগ্যের কথা, আবরণ উন্মোচিত হচ্ছে এবং অলৌকিক আচ্ছাদন ভেদ করে শ্রীচৈতন্যের অতিলৌকিক বা মহামানবিক দিকগুলি আমাদের সামনে ফুটে উঠছে। মধ্যযুগে, বিদেশী শাসনকালের প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ হয়ে উঠেও শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ আর অন্যান্য নানা সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতির বহু ঊর্ধ্বে যে আদর্শ-সমাজের সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, আজ তার রূপটি আমাদের কাছে স্পষ্ট। স্পষ্ট—আদর্শ আর জীবনাচরণের অভিন্নতাটিও।

মাধবের 'চৈতন্যবিলাস' রচিত হয়েছিল ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে।

তখনো মাধবের দ্বিতীয় পুঁথির দেওয়া তথ্য অনুসারে পুরীতে গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব শ্রীচৈতন্যকে 'প্রভু' বলে রথের ওপর থেকে ঘোষণা করেননি। এই ঘোষণা তিনি করেছিলেন ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে। তবু 'চৈতন্যবিলাসের' শুরু থেকেই শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণাবতার রূপে চিত্রিত। তাই মনে হয় 'চৈতন্যবিলাসের যে পুঁথি আমরা পেয়েছি তার প্রথম বেশ কিছু অংশ প্রক্ষিপ্ত। মাধব তাঁর বৈষ্ণবলীলামৃতের প্রথম অধ্যায়টির শুরু থেকে ঊনত্রিশটি শ্লোক শ্রীজগন্নাথের প্রশস্তি রচনায় ব্যয় করেছেন অথচ 'চৈতন্য বিলাসে'র শুরুতে তো নেইই, অন্যত্রও শ্রীজগন্নাথ প্রশস্তি অনুপস্থিত। রচনার প্রথম অংশ বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত। তার এই প্রমাণগুলি ছাড়া আরও একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। একটি পুঁথিতে শুরু করা হয়েছে—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

রূপ গোস্বামী রচিত 'বিদগ্ধমাধবের' এই শ্লোক (১।২) দিয়ে। আবার এই মাধবই তাঁর 'বৈষ্ণবলীলামৃত' গ্রন্থে শুনিয়েছেন যে রূপ ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে (৯।৮-১৫) 'বিদগ্ধ মাধব' নিয়ে শ্রীক্ষেত্রে আসেন এবং নাটকটি পড়ে শ্রীচৈতন্য, রায় রামানন্দ এবং উপস্থিত বৈষ্ণব গোষ্ঠীকে শোনান। এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করে চৈতন্যবিলাস পুঁথির অনুলেখক প্রমাণ করেছেন যে তাঁর অবাঞ্ছিত শক্তি প্রয়োগের ধৃষ্টতা তিনি দেখিয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে 'বৈষ্ণবলীলামৃত' গ্রন্থে মাধব পট্টনায়ক 'চৈতন্যবিলাস' পুঁথি নিজে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেছিলেন বলে উল্লেখ করে গিয়েছেন, নইলে এই পুঁথির রচনাকাল নিয়ে ঐ শ্লোকই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতো।

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ কাহিনীটুকুই ঐ পুঁথির উপজীব্য। সে ক্ষেত্রে বঙ্গীয় চরিতকারদের বর্ণিত ঘটনাবলীর সঙ্গে মাধব কর্তৃক বর্ণিত ঘটনার বৈসাদৃশ্য নেই। তিনি যে তাঁর দীক্ষাগুরুর কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বরাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়াকে শান্তি ও সান্ত্বনা দেবার কথা শুনে লিখেছেন—ঐ একটি বিষয়ই

মতানৈক্যের কারণ। ঐ কথা শুনিয়ে জয়ানন্দ নিন্দিত। ঐ কথা মাধবের রচনা থেকে নিয়েও লোচন কিন্তু শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। তবে—গৌড়ীয় ভক্তদের মতে ঐটি অসত্য। এছাড়া মুরারিকে গোপন করে ('সন্ন্যাস করিবু অছি বহুত বিলম্ব / যাই ভজ কৃষ্ণ কিছি ঘেনি অবলম্ব' ॥ ৫।২৬); গঙ্গা সাঁতার দিয়ে ওপারে চলে যাওয়া ('গলে গৌর গঙ্গার সমীপ/পার হোইলে ছাড়ি নবদ্বীপ ॥' ৬।৩৭); কেশব ভারতী কর্তৃক মায়ের আদেশ নিয়ে তবে সন্ন্যাস গ্রহণের উপদেশ প্রদান ('সাক্ষাত মাতাঙ্ক ঠারু মেলানি হোইন/অইলে সন্ন্যাসী দীক্ষা দেবা তোতে পুন ॥' ৭।২৪); স্বপ্নে সন্ন্যাসের মন্ত্রপ্রাপ্তি এবং সেই মন্ত্র কেশব ভারতীর কাণে শুনিয়ে প্রকারান্তরে তাঁরই গুরু হয়ে যাওয়া—

একদিন নিশারে মু দেখিলি স্বপন।
সন্ন্যাসের দীক্ষা মোতে কহে বিপ্রকর্ণ ॥
এতে বোলি ভারথীর কর্ণে কহে মন্ত্র।
এ প্রকারে তার গুরু হোইলে স্বতন্ত্র ॥ (৭।৩২-৩৩)

এসব ঘটনাই বঙ্গীয় গৌরচরিত গ্রন্থগুলিতেও দেখা যায় তাই এগুলিকে সত্য বলেই মানতে হয়—যদিও আগেই দীক্ষাগুরুর গুরু হয়ে যাওয়া, আমাদের চোখে বিসদৃশ ঠেকে। মুরারির কাব্যে এটি আছে যদিও মুরারির কাব্য মাধব পাঠ করেছিলেন, এ অনুমানের সুযোগ নেই। তাঁর বর্ণিত সমূহ বিষয় গুরু গদাধর পণ্ডিতের কাছেই শোনা। ঘটনাগুলির প্রত্যক্ষদ্রষ্টারা অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য এঁরা তখনো জীবিত। অন্যতম প্রত্যক্ষদ্রষ্টা গদাধর পণ্ডিত কিছু কল্পিত কাহিনী দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য মাধবকে শোনাবেন, এ অনুমানের ধৃষ্টতা আমাদের নেই।

মাধব তাঁর এই প্রথম পুঁথিতে কোন ঘটনারই সাল তারিখ উল্লেখ করেননি। অনেকের কাছে এটি কৌতূহলোদ্দীপক মনে হতে পারে এই জন্যে যে দ্বিতীয় পুঁথির প্রায় সমস্ত ঘটনার সঙ্গেই এগুলি উল্লিখিত। উভয় পুঁথির মধ্যে এই মৌলিক পার্থক্যের কারণ মাধবের অভিজ্ঞতা এবং দ্বিতীয় পুঁথিখানিতে বর্ণনায় বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং কালগত দৈর্ঘ্য। প্রথম পুঁথির বর্ণনীয় বিষয় ছিল একটি আর সেক্ষেত্রে সাল তারিখের উল্লেখ তেমন

প্রয়োজনীয় ছিল না। এবার আমরা এই দ্বিতীয় পুঁথির প্রথম অধ্যায় থেকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হবো এবং কবি কথিত ঘটনা ও সাল তারিখগুলির ঐতিহাসিকতা খতিয়ে দেখবো।

'বৈষ্ণব লীলামৃত' পুঁথির প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ঊনত্রিশটি শ্লোকের পর শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে কবি বলেছেন—'সে মহাতপা বৈষ্ণব/তাহাঙ্ক লীলা কে বর্ণিব ॥ (৩৩) প্রথম পুঁথির সূত্রপাতে 'বিদগ্ধ মাধব' থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছিল—

জয় গোকুল খণ্ডন ব্রজেন্দ্র নন্দন হে।
জগত কারণে বৃক্ষভানুজা জীবন হে ॥ ১ ॥
দশবিধ রূপ মহীভাগ হবে।
গোপীঙ্ক তোষিলে নিজ লীলা বিলাসরে ॥ ২ ॥

পার্থক্যটি বিচার্য।

দ্বিতীয় পুঁথিটির প্রথম অধ্যায়ের মোট ৮২টি শ্লোকের মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রশস্তিমূলক শ্লোকগুলি বাদ দিলে বাকী ৫৩টি শ্লোকের অধিকাংশই গুরু গদাধর পণ্ডিত সম্পর্কে শ্রদ্ধা নিবেদন, আশ্রয় ও শিক্ষাদাতা রামানন্দ সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখ প্রভৃতিতে ব্যয়িত হয়েছে। মূল্যবান সাল তারিখ যুক্ত দু'টি তথ্য এই অধ্যায়ে আছে—১) ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'চৈতন্য বিলাস' এবং ২) ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বৈষ্ণব লীলামৃত' রচনার উল্লেখ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবি প্রাচী নদীর কূলে যে জয়দেবের জন্মস্থান, সে কথার উল্লেখ করেছেন। সে কালে জয়দেব গোস্বামীর জন্মস্থান নিয়ে বাংলা-বিহার-ওড়িষ্যা এই তিনটি প্রদেশের মধ্যে বাদবিসংবাদ শুরু হয়নি। এর পরই শ্রীমন্দির বা শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির ও তার বিভিন্ন অংশ নির্মাণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন রাজার কথা এসেছে। কবি বলেছেন চোড়গঙ্গ উপাধিধারী রাজাই ১১৪৭ খ্রীষ্টাব্দের দু'চার বছর আগে বর্তমান মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। অনন্তবর্মা চোড় (চোল) গঙ্গদেব (১১১২-৪৮) যে মূল প্রতিষ্ঠাতা এতে ঐতিহাসিকরা একমত। ১১৪৮ খ্রীঃ পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকাল বিস্তৃত ছিল। এর সমাপ্তি ঘটার ছ'সাত বছর আগে শ্রীমন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল, এটি অসঙ্গত অনুমান নয়। মাধব বলেছেন, অনঙ্গ-ভীমদেব (১২১১-৩৮) 'বিমান' ও 'জগমোহনে'র

সঙ্গে 'নাটমন্দির' যোগ করেন। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান মন্দিরের পার্শ্ববর্তী মন্দিরগুলি এবং মঠ-আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনিই বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করেন ও জমি দান করেন।

এই অধ্যায়ে মাধব কপিলেন্দ্রদেব (১৪৩৫-৬৭ খ্রীঃ) কে 'মেঘনাদ প্রাচীর' নির্মাতা বলেছেন। কিন্তু ঐ প্রাচীরের যে বিরাট আকৃতি এখন দেখা যায় সেটি কিন্তু পুরুষোত্তমদেবের (১৪৬৭-৯৭) কীর্তি। 'ইহা পূর্বে আরও হ্রস্বাকার ছিল।' (সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ —'শ্রীক্ষেত্র' পৃঃ ৭৫) অতএব ভিত্তিপত্তন ঘটিয়েছিলেন কপিলেন্দ্রদেব এ কথা স্বীকার করতেই হয়।

মাধব বলেছেন শ্রীধর স্বামী কপিলাশ ব্রহ্মচারী মঠের মহান্ত ছিলেন। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামী (১৩৫০-১৪৫৪ খ্রীঃ) সম্ভবত তা নয়। এঁর সম্পর্কে নানা প্রকার কিংবদন্তী থাকলেও ইনি কাশীবাসীই ছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় এক শ্রীধর ব্রহ্মচারীর উল্লেখ দেখা যায়— 'শাখা শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী'। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় এঁকে গদাধর পণ্ডিতের শাখা এবং পূর্বলীলায় 'চন্দ্রলতিকা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান। পৃঃ ১৩৯০)। এই শ্রীধর ব্রহ্মচারী সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ইনিই কপিলাশের ব্রহ্মচারী মঠের মহান্ত ছিলেন, অসম্ভব নয়। শ্রীধর স্বামী কপিলাশ মঠে ছিলেন, ওড়িষ্যার ইতিহাসে তার উল্লেখ পাইনি।*

মাধব পুরুষোত্তমদেবকে (১৪৬৭-৯৭ খ্রীঃ) মূলমন্দির সংলগ্ন 'ভোগমণ্ডপের' নির্মাতা বলে এই অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ তাঁর 'শ্রীক্ষেত্র' গ্রন্থে বলেছেন (পৃঃ ৩২২) যে এটি বিশ্বাসযোগ্য কারণ এর উল্লেখ 'মাদলাপাঁজি'তেও দেখা যায়।

মাধব পুরুষোত্তমদেবকে 'ছেরাপহরা' বা স্বর্ণসম্মার্জনীতে রথমার্জনা করার প্রথাটির প্রবর্তক বলেছেন। এই বিষয়ে ভিন্ন কোন মতবাদের সন্ধান পাইনি তাই এই বর্ণনা সত্য বলেই গ্রহণ

* ওড়িষ্যার এক গবেষক আমাকে জানিয়েছেন যে শ্রীধর স্বামী কপিলাশ এসেছিলেন আর ছিলেনও বেশ কিছুদিন। তাঁর নামে কপিলাশে একটি মঠও স্থাপিত হয়েছিল।

করা যায় তাছাড়া পুরুষোত্তম দেব যে শ্রীজগন্নাথদেবের অন্যতম প্রধান ভক্ত ছিলেন এবিষয়ে ইতিহাসেও উল্লেখ আছে। Sidelights on History and Culture গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'He was a great devotee of the Lord and his name reflects the name of Jagannath. According to tradition, he was born due to the mercy of Lord Purusottama for which he was named after the Lord. After his coronation in 1467 A. D. he first thought of the service of the Lord lavishly endowed charities in the form of jewelleries and land for the performance of the daily worships of Lord Jagannath.' (Ed. M. N. Das. p. 412)

কিন্তু পুরুষোত্তম 'নাচুনী সম্প্রদা' বা দেবদাসীদের নৃত্যপ্রথা প্রচলন করেছিলেন, ওড়িষ্যার ইতিহাসে তার সাক্ষ্য মেলে না। দেবদাসী প্রথা ভারতের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত মন্দিরগুলিতেই ছিল কিন্তু ইদানীং এক শ্রীক্ষেত্র ছাড়া আর কোথাও নেই। মন্দিরে দেবদাসী নিয়োগ সম্পর্কে গবেষকের মন্তব্য, Chodagangadeva ruled from 1077 to 1147 and built the temples of Lord Jagannath at Puri having employed Devadasis. After Chodagangadeva's death Anangabhima Deva came to power and built several temples and also built the Nata mandira in the Jagannath temple. It was intended for the performance of the Maharis and Musicians in honour of the Lord'. (Ibid p. 785)

উপযুক্ত উদ্ধৃতিতে যাঁদের 'মাহারী' বলা হয়েছে তাঁরাই হলেন 'মহান নারী' বা দেবদাসী—দেবসেবার জন্য উৎসর্গিত নারী।

তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই মাধব একটি দীর্ঘকালীন ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। 'অভিনব গীতগোবিন্দ' শীর্ষক নাট্যকাব্যখানি পুরুষোত্তমদেবের রচনা বলেই সর্বত্র উল্লিখিত আছে।

মাধব শুনিয়েছেন যে দিবাকর নামে জনৈক পণ্ডিতই এটি রচনা করে রাজায় নাম ভণিতায় উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এর জন্যে রাজা যে তাঁকে বহু পুরস্কার দিয়েছিলেন, এর উল্লেখ করতে মাধব ভোলেন নি। রাজানুগৃহীত কবিরা কাব্যরচনা করে ভণিতায় রাজার নাম দিয়েছেন বা শিষ্য শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে গুরুর ভণিতাযুক্ত কিছু রচনা করেছেন, এ ধরণের উদাহরণ মধ্য-যুগে প্রচুর পাওয়া গেছে।

একালের গবেষকরা অবশ্য 'অভিনব গীতগোবিন্দ'খানি যে কবিচন্দ্র রায় দিবাকর মিশ্র (১৪৭০-১৫৫০) রচিত, একথা স্বীকার করেন। (Glimpses of Orissa Art & Culture, Orissa Historical Research Journal, Golden Jubilee Vol. 1984, p. 259) এ থেকে মাধবের বক্তব্যগুলি কতোদূর নির্ভর-যোগ্য তার একটি প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্বল্প শক্তিমান কবি আপন দুর্বল রচনাকে খ্যাতিমান কবির ভণিতায় রেখে গেছেন, এর উদাহরণও দুষ্প্রাপ্য নয়। রায় রামানন্দের ভণিতাযুক্ত কিছু রচনা ড. প্রিয়রঞ্জন সেন প্রকাশ করেছিলেন। ঠিক এমনি কিছু রচনা রামানন্দের ভণিতায় আমিও সংগ্রহ করেছি। এগুলি যে রায় রামানন্দেরই রচনা একথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় আবার পুরোপুরি অস্বীকার করার বাধাও অনেক। পুঁথির স্তূপ থেকে এগুলিকে উদ্ধার করে তিনিও প্রকাশ করে গেছেন, আমিও এগুলির প্রকাশের অপেক্ষায় আছি। গ্রহণ-বর্জনের কাজ ভবিষ্যতের গবেষকরা করবেন।*

যাই হোক 'অভিনব গীতগোবিন্দ' বিষয়ে তথ্যটি ভেবে দেখবার মতো। এটি ও 'গীতগোবিন্দ' নিয়ে যে বিবাদের বিবরণ মাধব শুনিয়েছেন তাতে কিঞ্চিৎ অলৌকিকত্ব আরোপিত হয়েছে। পুরুষোত্তম দেবের সময় থেকে 'অভিনব গীতগোবিন্দ' মন্দিরে গীত হোত। প্রতাপরুদ্রদেবের গুরু স্থানীয় 'কবিডিণ্ডিম' জীবদেবাচার্য এই নীতির মধ্যে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা

---

* বইটি 'রায় রামানন্দের নামাঙ্কিত কৃষ্ণলীলা' শীর্ষকে প্রকাশিত হয়েছে।

রাজাকে বলেন। এবং রাজাজ্ঞায় 'গীতগোবিন্দ' এবং অভিনব গীতগোবিন্দ' কখন কোনটি শ্রীমন্দিরে গীত হবে তার সময় সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। জীবদেবাচার্য শুধু রাজার শ্রদ্ধাভাজনই ছিলেন না, তিনি পরবর্তীকালে রায় রামানন্দের স্থলাভিষিক্ত হয়ে রাজমহেন্দ্রী যান। ইনি কবি এবং 'ভক্তি ভাগবত' রচয়িতা (রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বাংলাদেশের ইতিহাস', মধ্যযুগ, ১৩৭৩, পৃঃ ৮০)।

এই অধ্যায়ে মাধব বলেছেন ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-মার্চ (ফাল্গুন) মাসে আমন্ত্রিত হয়ে মাধবেন্দ্রপুরী সশিষ্য বেণ্টপুরে ভবানন্দ পট্টনায়কের বাড়িতে গিয়েছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের মতে মাধবেন্দ্রপুরী ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। তাহলে ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বেণ্টপুর যাওয়া অসম্ভব নয়।

'জগন্নাথ বল্লভ' নাটকখানির রচনা কাল জানা ছিল না। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে 'গীতগোবিন্দের' প্রভাবে বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। রায় রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভ নাটক'ও তাই। এর রচনাকাল সম্পর্কে ড. সুকুমার সেনের বক্তব্য হোল, 'চৈতন্যের নাম না থাকিলেও মনে হয়, চৈতন্যের সঙ্গে প্রথম মিলনের পরে বইটি লেখা হইয়াছিল।' (বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃঃ ৩৯৯)। গ্রন্থখানিতে শ্রীচৈতন্যের উল্লেখমাত্রও নেই তবু ড. সেন কেন এই অনুমান করলেন তার কোন ব্যাখ্যা দেননি। অথচ এই গ্রন্থ প্রসঙ্গেই তাঁর ইতিহাসের পরবর্তী খণ্ডে তিনি একথা স্বীকার করেছেন যে রায় রামানন্দ রাগানুগা ভক্তিমার্গের সাধক ছিলেন।

মাধব জগন্নাথবল্লভ নাটকখানির রচনাকাল ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দ বলেই উল্লেখ করেছেন আর এও শুনিয়েছেন যে নাটকটি শ্রবণ করে পরিতৃপ্ত প্রতাপরুদ্রদেব তাঁকে 'রায়' উপাধি দেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে রায় রামানন্দকে রাজমহেন্দ্রীতে পাঠানো হয়। ১৫০৭ সালে প্রতাপরুদ্রদেব যখন রাজমহেন্দ্রীতে যান তখন তিনি রায় রামানন্দকে কৃষ্ণসাধনার রসে নিমগ্ন দেখে ভৎসনা করেন। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে তিনি বহুপূর্ব থেকেই রাগানুগাভক্তিমার্গের সাধক ছিলেন। তাঁর পৈত্রিক গৃহে ১৫৯৯

খ্রীষ্টাব্দে মাধবেন্দ্রপুরীর সশিষ্য অবস্থান এবং নাম সংকীর্তনের যে তথ্য মাধব পরিবেশন করেছেন তাতে প্রমাণিত হয় যে ভবানন্দ পট্টনায়কের পরিবার রাগানুগা ভক্তিমার্গের অনুরাগী ছিলেন। ভবানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র রামানন্দ যে এই মার্গের সাধক ছিলেন তাও প্রমাণিত।

ওড়িষ্যার প্রাণপুরুষ শ্রীজগন্নাথদেব। ওড়িষ্যায় বৈধীভক্তি ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিবাদই স্বীকৃত। অথচ শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক তাঁর প্রেমধর্ম সম্পর্কে কিছু আলোচিত হবার মতো যখন কোন পরিবেশ নবদ্বীপ বা অন্যত্র সৃজিত হয়নি, বিশ্বম্ভর যখন দীক্ষাও গ্রহণ করেননি, তার বহু পূর্ব থেকেই রায় রামানন্দ রাগানুগাভক্তি-মার্গই অনুসরণ করছিলেন। এর ফলে সমকালীন বৈষ্ণব ও পণ্ডিত সমাজে তিনি নিন্দিত হতেন এবং স্বয়ং সার্বভৌমও তাঁর প্রতি অনুকূল ছিলেন না, এ তথ্য ওড়িষ্যার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব পরিবেশন করেছেন। 'উৎকল পাঠক সংসদ' প্রকাশিত 'ওড়িশার ভক্ত কবি' (প্রথম স্তবক, ১৯৮৪) নামক গ্রন্থে 'রায় রামানন্দ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ড. মহতাব লিখেছেন, 'কেবল সর্বজনসম্মানিত সার্বভৌমই যে রামানন্দকে উপহাস করতেন তাই নয়, তখনকার ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে যোগ-যাগ, তন্ত্র, অথর্ববেদ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদ এমন স্থান অধিকার করে বসেছিল যে, রামানন্দের প্রেম ভক্তি সাধারণ মানুষের দ্বারাও উপহসিত হচ্ছিল, এটি সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।' (পৃঃ ৫২)

ড. মহতাব উপর্যুক্ত প্রবন্ধে এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে বৈধী-ভক্তির ক্ষেত্র থেকে তাঁকে রাজমহেন্দ্রীতে প্রেরণের পেছনে সার্বভৌমর পরামর্শ এবং রামানন্দের বিশিষ্ট মতবাদই দায়ী। মাধব তো স্পষ্টই শুনিয়েছেন যে ১৫০৭ সালে রাজা যখন রাজমহেন্দ্রী যান তখন শাসন ব্যবস্থার চাইতে রাগানুগা ভক্তিমার্গের সাধনার প্রতি রামানন্দের বেশি অনুরাগ দেখে রাজা ক্ষুণ্ণ হন এবং রামানন্দকে ভর্ৎসনা করেন। (৩/১৪৮-৫০) মাধব এবং পরবর্তীকালে স্বরূপ দামোদরের নামে যে পুঁথি পাওয়া যায় তাতে স্বরূপ রামানন্দ আর শ্রীচৈতন্যের আলোচনার যে ধারা বর্ণনা করেছেন,

তাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে শ্রীচৈতন্যের চাইতে এই বিশিষ্ট মতবাদ সম্পর্কে রামানন্দের অধ্যয়ন, উপলব্ধি এবং অনুশীলন ছিল গভীরতর। আরও পরবর্তীকালে কবি কর্ণপুর এবং কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনাও এই অভিমতের পরিপোষক। এই দুই পণ্ডিত রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের ভক্তিমার্গ নিয়ে আলোচনা যে দশ দিন ধরে চলেছিল তার উল্লেখ করেছেন। স্বরূপের ভণিতায় প্রাপ্ত পুঁথিতে পাই—

দশদিনের কা কথা জাবত প্রাণ রয়।
তাবৎ তোমার সঙ্গে রহিব নিশ্চয় ॥
নীলাচলে জীবে তুমি রহিব এক সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণ কথা রঙ্গে ॥

মাধবের 'বৈষ্ণবলীলামৃত' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় বহু ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ। কৃষ্ণদেব রায় বিজয়নগরের সিংহাসনে ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে অভিষিক্ত হন এ কথা মাধব বলেছেন। মাধব রাজমহেন্দ্রীতে রায় রামানন্দের কাছেই থাকতেন অতএব তাঁর দেওয়া সালটি নির্ভুল। কৃষ্ণদেব সিংহাসনে আরোহণ করার পরই ওড়িষ্যা আক্রমণের পরিকল্পনা শুরু করেন। প্রতাপরুদ্রদেব বিজয়নগরের দিকে গিয়ে যখন কৃষ্ণদেব রায়ের পরিকল্পনা ব্যর্থ করার পরামর্শে ব্যস্ত তখনই হোসেন শাহের জনৈক সেনাপতি গাজী ইসমাইল পুরী আক্রমণ করে দারু বিগ্রহগুলি অপহরণের জন্য এগিয়ে আসেন। 'মাদলা পাঁজিতে' এ তথ্যের উল্লেখ আছে। এটি যে ঐতিহাসিক ঘটনা সে কথা রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাংলা দেশের ইতিহাস' গ্রন্থেও (মধ্যযুগ, পৃঃ ৮১) উল্লেখ করেছেন। মাধব বলেছেন যে, পুরীর শ্রীমন্দিরের সেবকেরা নৃসিংহ উপরায় নামক এক ব্যক্তির সহায়তায় বিগ্রহগুলিকে মন্দির থেকে সরিয়ে নিয়ে চিল্কা হ্রদের মধ্যস্থিত 'চড়াই' গুহার মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। দক্ষিণে কৃষ্ণবেন্বা নদীর তীরে এ সংবাদ প্রতাপরুদ্রদেবের কাছে পেঁছিলে তিনি চিল্কায় দেবদর্শনে যান আর ফিরেই বাংলার সুলতান হোসেন শাহের সৈন্যদলকে তাড়া করেন। রমেশ মজুমদার মাধবের বর্ণনাই সমর্থন করে লিখেছেন, 'চউমুহিঁতে প্রতাপরুদ্রদেব ও হোসেন শাহের মধ্যে বিরাট যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে পরাজিত

হইয়া হোসেন শাহ মান্দারণ দুর্গে আশ্রয় লন।' (তদেব, পৃঃ ৮১)

মাধবের মতে এই যুদ্ধের পর শ্রীক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের আগমন ঘটে এবং তিনি ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যারত জগন্নাথদাসের ভক্তিভাব দেখে পুলকিত হন। শ্রীচৈতন্য ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রীক্ষেত্রে আসেন এটিও সর্বসম্মত ঘটনা। মাধবের মতে শ্রীচৈতন্য প্রায় একমাস পুরীতে থাকার পর দক্ষিণে যাত্রা করেন কিন্তু কবি কর্ণপূরের মহাকাব্যে পাই তিনি পুরীতে অষ্টাদশ দিবস যাপন করার পর দক্ষিণে যাত্রা করেন। কবি কর্ণপূর লিখেছেন—

অষ্টদশাহানি স তত্র নীত্বা বিলোক্য তং দেবমতীবহর্ষাৎ।
প্রচক্রমে চংক্রমণায় নাথো বিমোহয়ন্ কাংশ্চন বিপ্রয়োগৈঃ॥
(১২।৭৪)

—শ্রীচৈতন্য ওখানে ১৮ দিন থেকে অত্যন্ত আনন্দে জগন্নাথদেব দর্শন এবং আপন ভক্তদের আনন্দিত করার পর তীর্থভ্রমণের জন্যে যাত্রার উপক্রম করলেন। প্রথমবার পুরী গিয়ে শ্রীচৈতন্য ১৮ দিন ছিলেন না প্রায় একমাস ছিলেন, এই বিষয়টির তেমন কোন গুরুত্ব নেই। তবু বলি, মাধব কিন্তু প্রত্যক্ষদ্রষ্টা, কবি কর্ণপূর নন।

দক্ষিণ যাত্রার আগেই আলোচনার মাধ্যমে বাসুদেব সার্বভৌম শ্রীচৈতন্যের মতাদর্শ বুঝে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বৈদান্তিক। তাঁর চিন্তার ধারা পরিবর্তিত হয়েছিল কিনা সে কথায় গুরুত্ব দেবার মতো উপাদান আমাদের হাতে নেই তবে তিনি যে এই 'নবীন সন্ন্যাসীর' ভগবদ্ভক্তির আত্যন্তিকতায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তার বহু প্রমাণ আছে। তিনিই স্বেচ্ছায় শ্রীচৈতন্যকে তাঁর আপন গৃহে স্থান দিয়েছিলেন এবং এই নবদ্বীপাগত নবীন সন্ন্যাসীর যথেষ্ট যত্ন নিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। অনুমান করি, নবদ্বীপ পরিত্যাগ করে চলে আসা এই পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে নবদ্বীপের কিছু কিছু খবর তীর্থযাত্রীদের মুখে মুখে এসে পেঁৗছে যেতো। গয়া থেকে মন্ত্রদীক্ষা নেবার পর বিশ্বম্ভরের জীবনে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে এবং তিনি কৃষ্ণকথায় কালাতিপাত করছেন, অনুমান করি, এ সংবাদ আগেই সার্বভৌম

পেয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁর ভ্রাতা বাচস্পতি তো নবদ্বীপবাসীই ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে আলোচনার পর এই পণ্ডিত মানুষটি স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে, ভক্তিতত্ত্বের যে মার্গে শ্রীচৈতন্য আগ্রহী, সেই মার্গানুযায়ী সাধনায় বহুপূর্ব থেকেই নিযুক্ত রয়েছেন রামানন্দ। তাই তিনি শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণযাত্রার প্রাক্কালে তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে রামানন্দের 'রাগমার্গে মতিরত' এবং স্বীকার করেছিলেন 'কৃষ্ণকথা মু ন জানই/রাম রায় সবু জানই'। (৪।৬২)।

মাধবের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে রামানন্দ এবং শ্রীচৈতন্যের দশদিনব্যাপী আলোচনার তিনি যে অন্যতম শ্রোতা ছিলেন, এ অনুমান অসঙ্গত নয়। মাধব বলেছেন যে শ্রীচৈতন্য রাম রায়কে 'গুরু' বলে সম্বোধন করে স্বীকার করেছিলেন 'দুর্লভ তত্ত্ব উপদেশিল' অতএব 'গুরু পরায়ে স্মরুথিবি/ ক্ষণে মনরু ন ছাড়িবি' ॥ (৪।১২৬) এই বর্ণনা একদিকে রায় রামানন্দের রাগানুগা ভক্তিমার্গে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং শ্রীচৈতন্যের পরম বৈষ্ণবোচিত বিনয়েরই প্রমাণ। নবদ্বীপে এই বিশেষ ভক্তিতত্ত্বে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে আলোচনার উপযুক্ত ব্যক্তি যে কেউ ছিলেন না, এ তো ঐতিহাসিক তথ্য। অদ্বৈত আচার্য এই মার্গের রসিক ছিলেন না। ভক্তির চাইতে জ্ঞানই বড়, একথা তিনি চৈতন্যকে বলেছিলেন বলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ উল্লেখ করেছেন। অতএব রায় রামানন্দের সঙ্গে দীর্ঘ দশদিনব্যাপী আলোচনা যে শ্রীচৈতন্যের জীবনে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্য এই বিষয়ে রূপ ও সনাতনকে যে পরামর্শ বা শিক্ষা দেন তাতেও রায় রামানন্দের যে বিশেষ মূল্যবান অবদান ছিল এটি অস্বীকার করার কোন পথ নেই। রূপ রামানন্দের কাছেও নিজেই কিছু পেয়েছিলেন, সে কথা পুঁথির মধ্যেই আছে। দক্ষিণ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রীচৈতন্য আবার রায় রামানন্দকে শ্রীক্ষেত্রে চলে আসার পরামর্শ দিয়ে আসেন। অবশ্য ফেরার পথে এই দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা, সে বিষয়টি বিতর্কিত।

১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেই হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য যে বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেব রায় প্রস্তুত হচ্ছিলেন

এ তথ্য রাজা প্রতাপরুদ্রদেব অবশ্যই রাখতেন। সেই সঙ্গে এও তিনি জানতেন যে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে রামানন্দের সাক্ষাৎ এবং আলোচনার পর কৃষ্ণদেব রায়ের আক্রমণ প্রতিরোধের ভার রামানন্দের ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্রদেব রামানন্দকে শ্রীক্ষেত্রে নিয়ে এলেন আর তাঁকে শ্রীমন্দিরের দেখাশোনার কর্তৃত্ব দিলেন। রাজার শ্রদ্ধা-ভাজন এবং সুপণ্ডিত জীবদেবাচার্য নিশ্চয় রণনীতিতে সুদক্ষ ছিলেন। তাঁকে 'বাহিনী পতি' উপাধি দিয়ে রাজমহেন্দ্রী পাঠানো হোল।

রায় রামানন্দ শ্রীমন্দিরের ভার পেয়ে খুবই আনন্দিত হলেন। তিনি মন্দিরের উত্তর দিকে একটি 'মণ্ডপ' তৈরী করালেন। ওই মণ্ডপেই বৈষ্ণবেরা মিলিত হতেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে মাধব কয়েকটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। চৈতন্য ভাগবতে আছে, প্রতাপরুদ্রদেব আড়াল থেকে প্রথমবার শ্রীচৈতন্য দর্শন করেন। মাধব অন্য কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে রথের সময় রথের ওপর থেকেই কীর্তন ও নৃত্যরত শ্রীচৈতন্যকে বৈষ্ণবগোষ্ঠীর মধ্যে দর্শন করেন। রাজার সঙ্গে কুশল বিনিময় হয় এবং রাজা শ্রীচৈতন্যকে কাশী মিশ্রের বাড়িতে এসে থাকার পরামর্শ দেন।

মাধব বলেছেন রামকেলি গিয়ে শ্রীচৈতন্য রূপ সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মুরারি গুপ্তের কড়চাখানির তৃতীয় প্রক্রমের ১৮শ সর্গে আছে, শ্রীগৌরাঙ্গ রামকেলি এসেছেন শুনে সনাতন অনুজ রূপকে নিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে এসেছিলেন। (১-২)

মাধব এই অধ্যায়ে কবীরের শ্রীক্ষেত্র আগমন সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। শুধু কবীরই (১৪৪০-১৫১৮ খ্রীঃ) নন, নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রীঃ)-ও শ্রীক্ষেত্রে এসেছিলেন তার বর্ণনা আছে বিভিন্ন গ্রন্থে। পুরীর বালিসাহি নামক স্থানটিতে 'কবীর মঠ' এখনও দেখা যায়। কিন্তু কবীরের শ্রীক্ষেত্রে আসার কথা ওড়িষ্যার ইতিহাসে পাইনি।

শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও নির্মল নারায়ণ গুপ্ত তাঁদের

'পুরুষোত্তম শ্রীচৈতন্য' গ্রন্থে (রত্নাবলী, ১৯৮৫) আসামের রামচরণ ঠাকুরের একটি গ্রন্থ থেকে কিছু ছত্র উদ্ধৃত করে (পৃঃ ৩০০-১) দেখিয়েছেন যে কবীরের মৃতদেহ নিয়ে যখন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিবাদ বাধে তখন শ্রীচৈতন্য স্বয়ং সে মরদেহ তুলে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেন। কবীর দেহত্যাগ করেন ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু তাঁর জন্ম কাশীতে হলেও, কোথায় তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন তার কোন সঠিক বিবরণ নেই। ছত্তিশগড়ে যে কবীরপন্থীদের একটি বড় আশ্রম আছে, একথা সবাই জানেন। শ্রীচৈতন্য ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কাশী থেকে পুরী ফিরে আসেন। তাই ১৫১৮ সালে শবদেহ বহন প্রসঙ্গটি সহজভাবে গ্রহণ করা দুরূহ।

এরপর মাধব সনাতন প্রসঙ্গ এনেছেন। বলেছেন, তিনি অসুস্থ (ব্রণ রোগাক্রান্ত) ছিলেন বলে রথের চাকার তলায় আত্মহত্যা করতে উদ্যত হন। তাঁকে রক্ষা করেন স্বরূপ দামোদর, তুলসী পরিছা, অচ্যুতানন্দ, অনন্ত, কাহ্নাই খুণ্টিয়া প্রভৃতি ভক্তজন। খবর শুনে শ্রীচৈতন্য ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হন। মাধবের মতে সনাতন পুরীতে প্রায় এক বছর ছিলেন।

বিষয়টি কবিরাজ গোস্বামী তাঁর 'চৈতন্য চরিতামৃতে'র অন্ত্য-লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে এইভাবে বর্ণনা করেছেন—

নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচলে আইলা॥
ঝারিখণ্ডপথে আইলা একলা চলিয়া।
কভু উপবাস কভু চর্ব্বণ করিয়া॥
ঝারিখণ্ডের জলের দোষ উপবাস হৈতে।
গাত্রকণ্ডু হৈলা রসা পড়ে খাজুয়া হৈতে॥

*　　　*　　　*

সনাতন ভাবলেন—

জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁর রথচাকায় এই ছাড়িব শরীর॥

কবিরাজ গোস্বামী একথা বলেন নি যে সনাতন সত্যই রথের চাকার সামনে প্রাণ বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন, তবে এই ঘটনা

যে সত্য তার প্রমাণ মেলে কিছু পরের কয়েকটি শ্লোকে। সেখানে শ্রীচৈতন্য সনাতনকে বলছেন—

"সনাতন দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে।
কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না নাই পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে॥
দেহত্যাগাদি এই তমোধর্ম্ম।
তমো রজো ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম॥

অতএব মাধবের বর্ণনা যে সত্যান্বিত তার প্রমাণ পাওয়া গেল। শ্রীচৈতন্যকে সনাতন তাঁর মনের কথা জানাননি। তিনি কিন্তু নির্ভুলভাবে ভক্তের মনের কথা বুঝেছিলেন আর আত্মহত্যা করা থেকে সনাতনকে নিবৃত্ত করেছিলেন। ঠিক এমনি ঘটনা নবদ্বীপে মুরারিগুপ্তের বেলাতেও ঘটেছিল। সেখানেও চৈতন্য মুরারির গোপন উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন আর তাঁকেও আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন।

'বৈষ্ণবলীলামৃত' গ্রন্থের এই অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে বল্লভাচার্য—

রথকু আসি মাস দুই।
রহিলে বল্লভগোসাঁই॥ (১০৬)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে হরিদাস দাস, বল্লভভট্ট বা বল্লভাচার্য সম্পর্কে দীর্ঘ (পৃঃ ১৩৬১-৬২) আলোচনা করেছেন। তিনি প্রেমভক্তিমার্গের সাধক ছিলেন না তবু শ্রীচৈতন্য যখন বৃন্দাবন যান তখন উভয়ের মধ্যে পরিচয় হয় এবং বল্লভাচার্য শ্রীচৈতন্যকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। হরিদাস দাস প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও বলেছেন যে, একবার তিনি নীলাচলেও এসেছিলেন। শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন যান ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে। সেই বিচারে ১৫১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন একসময় তিনি শ্রীক্ষেত্রে এসেছিলেন ধরে নেওয়া যায়।

এবার মাধব যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন সেটি ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল। উভয়ের পূর্বজন্ম সম্পর্কে জগন্নাথ দাসের ধারণা কি, এই প্রশ্নের উত্তরে জগন্নাথ বলেছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের এবং

শ্রীরাধার হাস্য থেকে যথাক্রমে শ্রীচৈতন্য এবং জগন্নাথ দাসের উৎপত্তি। এই ব্যাখ্যা শুনে শ্রীচৈতন্য অত্যন্ত প্রীত হন এবং স্বীয় উত্তরীয় জগন্নাথ দাসের মাথায় বেঁধে দিয়ে তাঁকে 'অতিবড়' আখ্যা দেন।

বহু পরবর্তী কালে রচিত দিবাকর দাসের 'জগন্নাথ চরিতামৃত' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের কাহিনীটি দিবাকর দাস ঠিক এইভাবেই বর্ণনা করেছেন। সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বিষয়টির উল্লেখ করেছেন (শ্রীক্ষেত্র, পৃঃ ৩৩৬-৩৮) কিন্তু বলেছেন যে শ্রীচৈতন্য কর্তৃক ঐ 'অতিবড়' আখ্যা প্রদান 'নিশ্চয়ই শ্লেষব্যঞ্জক বা রঞ্জনা-কারক আখ্যাবিশেষ'। আমাদের মনে হয় শ্রীচৈতন্যের সম্পর্কে অর্থাৎ তাঁর মানসিকতা সম্পর্কে এই উক্তি অসম্মানজনক। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে পঞ্চসখার বিশেষ করে বলরাম এবং জগন্নাথ দাসের সঙ্গে নিবিড় শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল। এই দুজনের মধ্যে ভাগবত রচয়িতা জগন্নাথদাসের সঙ্গে হৃদ্যতাই ছিল সর্বাধিক। শ্রীচৈতন্যের মতো বৈষ্ণবাচার্য এবং অবতার-পুরুষ আপন প্রীতির পাত্রকে 'শ্লেষাত্মক' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, এই রকম একটি চিন্তা আসলে শ্রীচৈতন্যের নির্মল এবং পবিত্র চরিত্রেই দোষারোপ। তিনি কাউকে 'বঞ্চনা' করতে চেয়েছিলেন একথা ভাবা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

এই অধ্যায়ে মাধব বলরামদাস ও রথযাত্রা নিয়ে একটি অলৌকিক কাহিনী শুনিয়েছেন। 'অলৌকিক' আর 'অসত্য', এ দুটি শব্দকে আমরা সমার্থক কখনোই মনে করি না। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এমন বহু ঘটনা আজও ঘটে, কোন তীক্ষ্ন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেও যার ব্যাখ্যা মেলে না। তাছাড়া এই ঘটনার বর্ণনা অন্যান্য ওড়িয়া গ্রন্থেও আছে, কিংবদন্তীতেও আছে—যেমন আছে ভক্ত কবি সালবেগের বিষয়ে। তিনিও রথে জগন্নাথদেবকে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দূর দেশ থেকে রথযাত্রার দিন এসে পৌঁছতে পারলেন না তাই হাজার চেষ্টাতেও রথকে নড়ানো গেল না। সালবেগ পুরী পৌঁছে রথের ওপর জগন্নাথ-দর্শনের পর রথের চাকা গতি ফিরে পেলো। মাধবের কাহিনীতে বলরাম অপমানিত হয়ে রথের ওপর থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। ক্ষুব্ধ ভক্ত

জগন্নাথ এবং বলরাম ও সুভদ্রাকে আহ্বান জানালেন সমুদ্রের তীরে নির্মিত বালির রথে। ভক্তের আহ্বানে ভগবানকে সাড়া দিতেই হয়—যদি সে আহ্বান পরম আন্তরিক হয়। দেবতারা বলরামদাসের আহ্বানে সাড়া দিলেন তাই 'বড় দাণ্ড'-এর ওপর হাজার হাজার মানুষের চেষ্টাতেও রথের চাকা অনড় রইলো। পরদিন রাজা সঙ্গীসাথীদের নিয়ে বলরামদাসের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁকে ফিরিয়ে আনার পর রথের যাত্রা শুরু হয়।

মাধবের রচিত গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে একটি তাত্ত্বিক সমস্যার কথা বর্ণিত হয়েছে। সমস্যাটি 'হরেকৃষ্ণ' আর 'হরেরাম' নিয়ে। ১৬ নাম আর ৩২ অক্ষরের এই নাম কীর্তনটিতে উৎকলের ভক্তরা 'হরেরাম' আগে বলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বলেন 'হরেকৃষ্ণ' আগে। ঐ ১৬ নাম আর ৩২ অক্ষরে পাওয়া যায় 'হরে' ৮ বার, 'রাম' ৪ বার, কৃষ্ণ ৪ বার। এখানে 'রাম' ৪ হলেন—'বিরাট', 'শেষদেব', 'অনন্ত' ও 'বলভদ্র'। 'কৃষ্ণ' ৪ হলেন—'লীলাঙ্গ কৃষ্ণ', 'স্তোককৃষ্ণ', 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'বালকৃষ্ণ'। এই চার কৃষ্ণের প্রকৃতি স্বরূপিণী হলেন 'রাধা', 'চন্দ্রাবলী', 'দূতী' এবং 'ত্রিপুরা'। অপর পক্ষে চারটি রামের সঙ্গে যুক্ত শক্তিগুলি হলেন 'রামা', 'রামাবলী', 'রেবতী' ও 'যোগমায়া'। আবার 'হরেকৃষ্ণ হরেরাম' এই ৮ অক্ষর ৮ জন সখীরই যে প্রতীক তাও বলা হয়েছে। সেই আটজন হলেন 'ললিতা', 'বিমলা', 'শ্রীরাধা', 'শ্রীমতী', 'হরিপ্রিয়া', 'সুকেশী', 'সচলা' ও 'পদ্মা'।

আগে একবার উল্লেখ করেছি ওড়িষ্যার ধর্মচেতনা সম্পূর্ণভাবে শ্রীজগন্নাথ-প্রভাবিত। তিনিই পূর্ণব্রহ্ম—ষোলকলার প্রতিমূর্তি। এই ধারণার পোষকদের মতে 'কৃষ্ণ' হলেন ঐ ষোল কলার একটি কলা মাত্র। অপর পক্ষে বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবান অভিন্ন। বিবাদ ঐখানে। উৎকলের জগন্নাথ প্রেমিক বৈষ্ণবদের পক্ষে 'হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে' আগে উচ্চারিত হওয়া উচিত অথচ গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বলেন 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে'—তারপর ওপরের ছত্র অর্থাৎ 'হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে'।

সমন্বয়ধর্মী মনোভঙ্গির প্রতিমূর্তি শ্রীচৈতন্য শিবানন্দ সেন ও

কাহ্নাই খুণ্টিয়া উত্থাপিত এই বিতর্কের অতি সহজ সমাধান দিলেন। তিনি বললেন, দু'টি প্রদেশে নামগানের দু'টি পৃথক রীতি যদি প্রচলিত থাকে, তাতে কোন অসুবিধে নেই। ঘুরে ফিরে ১৬ নাম ৩২ অক্ষরই তো উচ্চারিত হচ্ছে।

একটি বিশেষ দর্শন বলে 'রাম' নামের অর্থও রাধাকৃষ্ণ— কামবীজ ও রজঃ এই দুয়ের প্রতীক। এই দুয়ের সম্মিলনেই যে 'বিরাট' আবির্ভূত হন তাঁর মস্তকে বিরাজমান রাধাকৃষ্ণ। আবার ঐ বিরাট থেকেই 'জীব'-এর উৎপত্তি। অতএব 'রাধাকৃষ্ণ'ই সব। 'হরেরাম' বা 'হরেকৃষ্ণ' কোন ১৬ অক্ষর আগে গীত হবে, এ নিয়ে বিতর্ক নিতান্তই অজ্ঞতাপ্রসূত। শ্রীচৈতন্য তাই স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে রায় দিয়ে সমস্যার সমাধান করেছিলেন। মাধবের মতে এই নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত হতেই শিবানন্দ ও কাহ্নাই দু'জনে যান স্বরূপ দামোদরের কাছে। স্বরূপ ওঁদের নিয়ে গেলেন জগন্নাথ দাসের কাছে। জগন্নাথ দাস তিনজনকে নিয়ে যান শ্রীচৈতন্যের কাছে। তিনি সব শুনে সঙ্গে সঙ্গে রায় রামানন্দ, সার্বভৌম এবং কাশী মিশ্রকে ডেকে পাঠান। এরপর মন্দিরের উত্তরপাশেয় মণ্ডপে বহু আলোচনা হবার পর স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ স্বয়ং শ্রীচৈতন্য ঘোষণা করেন। গৌড়ীয় এবং উৎকলীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে দীর্ঘকালীন বিবাদের ঘটনা সকলেই স্বীকার করেন।

এরপর ছোট হরিদাস ও মাধবীদাসী প্রসঙ্গটি মাধব বর্ণনা করেছেন। বিষয়টি কবিরাজ গোস্বামী একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। মাধবীদাসী ও তাঁর দুই ভাই শিখি এবং মুরারির কথা কবি কর্ণপূরও বলেছেন। কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, ভগবান আচার্য সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যকে একবার তাঁর গৃহে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। এই পরম সম্মানিত অতিথিদের জন্য কিছু ভালো চাল সংগ্রহের জন্য ভগবান আচার্যই কীর্তনীয় ছোট হরিদাসকে মাধবীর বাড়ি পাঠান। খেতে বসে শ্রীচৈতন্য প্রশ্ন করলেন 'উত্তম অন্ন এত তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা।' উত্তর দিলেন ভগবান আচার্য, 'মাধবী পাশে মাগিয়া আনিলা।' এরপর প্রশ্ন থাকে কারণ ভক্ত ভগবান আচার্য ছিলেন খঞ্জ। শ্রীচৈতন্য জানতে

চাইলেন, 'কোন্ যাই মাগিয়া আনিল।' এর উত্তরে তিনি শুনলেন যে হরিদাসকে পাঠানো হয়েছিল তণ্ডুল সংগ্রহের জন্য। ছোট হরিদাসও সন্ন্যাসী তবু 'বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ'—অতএব শ্রীচৈতন্যের আদেশ ঘোষিত হল—

আজি হতে এই মোর আজ্ঞা পালিবে।
ছোট হরিদাসে ইহ আসিতে না দিবে॥

হরিদাস এতোই ক্ষুণ্ণ হন যে তিনি শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে যান আর গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। স্বরূপ দামোদর, গদাধর পণ্ডিত বা এই রকম দু' চারজন ছাড়া অন্যান্য সাধারণ বঙ্গীয় ভক্ত যাঁরা চৈতন্যের কাছে এসে দীর্ঘকাল থাকতেন, তাঁদের মধ্যে ধীরে ধীরে কিছু ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিল। এগুলির মধ্যে ছিল অদীক্ষিত জগন্নাথ দাসকে অত্যধিক মূল্য দেওয়া, উৎকলের ভক্তগণকে নাম কীর্তনের ব্যাপারে বঙ্গীয় রীতির অনুগামী করে না তোলা এবং শেষ ঘটনা—হরিদাসকে ক্ষমা না করা। অদোষদর্শিতা বৈষ্ণবের বড় গুণ কিন্তু নারীর সান্নিধ্য বৈষ্ণবের মনে বিকার সৃষ্টি করতে পারে—একথাও অস্বীকার করার মতো নয়। জগন্নাথ দাসও এই কথা বলেছেন। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বিশ্বাস, ছোট হরিদাস যে মাধবী দাসীর বাড়ি যান এবং এ নিয়ে কিছু অপবাদ শ্রীক্ষেত্রে প্রচারিত হয়েছে—একথা আগেই শ্রীচৈতন্যদেবের কানে গিয়েছিল। নইলে শুধু চাল চেয়ে আনতে গিয়েছিলেন বলেই তিনি ছোট হরিদাসকে বর্জন করেছিলেন, বিশ্বাস করা কঠিন। তাছাড়া এক্ষেত্রে অপরাধ তো ভগবান আচার্যের। তিনি হরিদাসকে পাঠিয়েছিলেন। বৃদ্ধা মাধবী পরম বৈষ্ণবী এবং শ্রীচৈতন্যের প্রধান ভক্তদের অন্যতম ছিলেন। জগন্নাথ দাস যখন ঘোষণা করেন নারীর সংসর্গ বৈষ্ণবদের পক্ষে বর্জনীয় তখন মাধবীই বৈষ্ণব ইষ্টগোষ্ঠীতে যোগদান বন্ধ করেন। হতে পারে, ছোট হরিদাস মাঝে মাঝে মাধবীর খবর নিতেই যেতেন। যাই হোক, হরিদাসকে গুরুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। প্রতিবেশিদের কুৎসা রটনায় উত্তেজিত হয়ে মাধবীর ভ্রাতারা হরিদাসকে একদিন তাঁদের বাড়িতে সন্ধ্যার পর দেখে প্রহার করেছিলেন—মাধবের এই বর্ণনা অবিশ্বাসের কারণ নেই। বরং আমাদের মনে হয়, এর

আগেই ভগবান দাস কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে হয়তো দিনের বেলায় হরিদাস চাল আনতে গিয়েছিলেন। মাধবও বলেছেন, হরিদাস চাল-নুন আনতে যেতেন। শেষপর্যন্ত হরিদাসের দণ্ড যে তাঁর পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

হরিদাসের আত্মহত্যার সংবাদ শ্রীক্ষেত্রে পেঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ক্ষোভ বঙ্গীয় ভক্তদের এই সিদ্ধান্ত নিতে প্রণোদিত করে যে তাঁরা আর শ্রীক্ষেত্রে থাকবেন না। বঙ্গদেশ থেকে যাত্রী আনা ও সে থেকে কিছু উপার্জন করা নিয়ে শিবানন্দ সেন এবং কাহ্নাই খুণ্টিয়ার মধ্যে বিবাদের ঘটনা তো ছিলই। সব কিছু একত্রিত হয়ে গেল এবং শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করে বঙ্গীয় ভক্তেরা একদিন প্রভাতে বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শিবানন্দ এই ঘটনা শ্রীচৈতন্যকে জানান এবং এই অভিমত প্রকাশ করেন যে ঐ ভক্তদের ফিরিয়ে আনা উচিত। সপ্তদশ শতকে দিবাকর দাস তাঁর 'জগন্নাথ চরিতামৃত' গ্রন্থে লিখছেন যে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ দাসকে সঙ্গে নিয়ে ভক্তদের ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়েও বঙ্গীয় ভক্তদের সামনে জগন্নাথ দাসের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর ফলে ওঁরা আরও বিরক্ত হন এবং শ্রীচৈতন্যের অনুরোধ রক্ষা না করেই বঙ্গদেশে চলে যান। এই বিবরণ সর্বৈব সত্য নয়। মাধবের বর্ণনায় পাই শ্রীচৈতন্য শিবানন্দ সেন আর স্বরূপ দামোদরকে জানান যে তিনি জগন্নাথ দাসকে নিয়ে ওদের ফিরিয়ে আনতে যাবেন। কিন্তু জগন্নাথ দাসই মানা করেন। স্থির হয়, একটি চিঠি নিয়ে শিবানন্দই যাবেন। শিবানন্দ গিয়েও ছিলেন একটি লিপি নিয়ে কিন্তু বঙ্গীয় ভক্তেরা প্রত্যাবর্তন করেননি। ঘটনাটি সম্ভবত ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন থেকে ফেরার পর।

এই লিপি সম্পর্কে মাধব একটি নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শ্রীচৈতন্যের বক্তব্য শুনে জগন্নাথ দাসই আটটি শ্লোক রচনা করে শিবানন্দের হাতে দেন। দেবার আগে অবশ্য জগন্নাথ কী লিখেছেন তা পড়ে শোনান আর সবটুকু শুনে পরম আনন্দে শ্রীচৈতন্য তাঁকে আলিঙ্গন করেন। এই লিপিতে যে আটটি

শ্লোক ছিল সেগুলিকে বলতে পারি বৈষ্ণবদের জন্য চর্যাচর্য—নির্দেশ। এগুলিই 'শিক্ষাষ্টক' নামে প্রচলিত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে হরিদাস দাস লিখেছেন, 'শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরচিত আটটি শ্লোক—ইহাতে প্রেম প্রাপ্তির উপাদান বিবৃত হইয়াছে।' (পৃঃ ১৭৮৩)। বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'শ্রীচৈতন্য চরিতে'র উপাদান গ্রন্থে নবম যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন সেটিও শ্রীচৈতন্যের রচনা বলে তিনি চারখানি পুঁথিতে দেখেছেন। ওটিও বহু পরিচিত শ্লোক—

> নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
> নো বা বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
> কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে—
> র্গোপীভর্ত্তুঃ পদ কমলয়োদাস দাসানুদাসঃ ॥

ড. নীলরতন সেন তাঁর 'বৈষ্ণবপদাবলীর পরিচয়' গ্রন্থে (বুকল্যাণ্ড, ১৯৬৮) বলেছেন, 'সনাতনকে যে নীতি উপদেশ দিয়েছিলেন বৈষ্ণবধর্মে তা শিক্ষাষ্টক নামে প্রসিদ্ধি পেয়েছে (পৃঃ ৪১)। 'চৈতন্য চরিতামৃতে' আত্মহত্যা থেকে বিরত করার পর সনাতনকে শ্রীচৈতন্যের উপদিষ্ট বৈষ্ণবের অনুসরণীয় পন্থাবলীর বিবরণ কবিরাজ গোস্বামী দিয়েছেন। সেই পন্থাবলীর কিছু আমরা সনাতন প্রসঙ্গে উদ্ধৃতও করেছি। কিন্তু 'শিক্ষাষ্টক' সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির রচনা। রচনারীতির দিক থেকেও সেই আটটি শ্লোকের সঙ্গে উপর্যুক্ত শ্লোকের কোন সামঞ্জস্য নেই। তাছাড়া 'শিক্ষাষ্টক'কে আমি বৈষ্ণব সমাজের 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়' বলতে পারি অপরপক্ষে উপর্যুক্ত শ্লোকটি শ্রীচৈতন্যের আপন বৈষ্ণবীয় সত্তারই পরিচায়ক।

বিচার্য বিষয়—'শিক্ষাষ্টক' সনাতন গোস্বামীর উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল কিনা। এর সমর্থন কোথাও দেখিনি। সনাতনকে শ্রীচৈতন্য যা বলেছিলেন (চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনা) তার সঙ্গে শিক্ষাষ্টকের বক্তব্যে পার্থক্য অনেক। মাধবের সমগ্র রচনার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা আমরা খুঁটিয়ে বিচার করে চলেছি প্রথম থেকেই। তাঁর কোন উক্তিকে অসত্য বলবার মতো সুযোগ আমরা পাইনি। অবশ্য এর আরও প্রমাণ—অর্থাৎ মাধবের বর্ণনাগুলির

ঐতিহাসিকতা যে অকাট্য, তা আমরা শেষের তিনটি অধ্যায়েও পাবো। এখানে আমরা 'শিক্ষাষ্টক' বলে অভিহিত ৮টি শ্লোকের রচনা কোন্ পরিস্থিতিতে হয়েছিল এবং রচনার প্রকৃতি সম্পর্কেও কিছু নতুন তথ্য পেলাম। আমরা কখনোই এ কথা বিস্মৃত হবো না যে রায় রামানন্দের 'ছায়া' (মাধবেরই উক্তি) মাধব এসব বহু ঘটনারই দ্রষ্টা ও শ্রোতা।

মাধব তাঁর সপ্তম অধ্যায় শুরু করেছেন জগন্নাথ দাসের দীক্ষা প্রসঙ্গ নিয়ে। তিনি আনুষ্ঠানিক দীক্ষা নেন নি অথচ তাঁকে 'স্বামী', 'অতিবড়' ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়—এগুলির যে বিরূপ সমালোচনা হয়েছে, তা অবশ্যই জগন্নাথ দাস জানতেন। ১৫১৭-১৮ সালের মধ্যে জগন্নাথ তাই বলরাম দাসের কাছে দীক্ষা নেন। এই পরামর্শ তাঁকে শ্রীচৈতন্যই দিয়েছিলেন। জগন্নাথদাস ব্রাহ্মণ হয়েও বলরামদাসের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন, এটি কাশী মিশ্র সু-নজরে দেখেন নি। কিন্তু অন্যেরা এ কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনদর্শন এবং জীবনাচরণ শ্রীক্ষেত্রের পরিবেশকে প্রভাবিত করেছিল।

মাধব উল্লেখ করেছেন যে এরপর শ্রীচৈতন্য যে গোবর্ধন শিলা (শালগ্রাম) প্রত্যহ পূজা করতেন, তার পূজার ভার তিনি শূদ্র রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে দেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে উল্লিখিত হয়েছে যে, 'শ্রীমহাপ্রভু প্রীত হইয়া শ্রীদাস গোস্বামীকে গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা দিয়াছিলেন, তাহা সর্বত্র প্রসিদ্ধ' (পৃঃ ১৩২৬)। চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ৬ষ্ঠ শ্লোকেও এর উল্লেখ পাই—'তুষ্ট হঞা শিলামালা রঘুনাথে দিল ॥' অতএব মাধব সত্য ঘটনাই বর্ণনা করেছেন। উনি প্রায় কালানুক্রমিকভাবেই কাহিনীগুলিকে বলে গেছেন। তাই মনে হয় এটি ১৫১৮ বা তারই কাছাকাছি কোন এক সময়ের ঘটনা।

ইতিমধ্যে ১৫১২ থেকেই বিজয়নগরের সঙ্গে ওড়িষ্যার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ওড়িষ্যা ১৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরের যে সব অঞ্চল এবং দুর্গ ছিনিয়ে নিয়েছিল, কৃষ্ণদেব রায় সেগুলির পুনরুদ্ধারে যত্নবান হন। সাতবছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল।

ইতিমধ্যে খরা এবং বন্যার ফলে ওড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং প্রতাপরুদ্রের সৈন্যবাহিনী পিছু হটতে থাকে। এই সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন প্রতাপরুদ্রের অন্যতম পুত্র বীরভদ্রদেব এবং জীবদেবাচার্য বাহিনীপতি। সম্ভবত ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে এঁরা উভয়ে কোণ্ডাবেড়ু দুর্গে আশ্রয় নেন। তাঁদের সঙ্গে দশ-হাজার সৈন্য ছিল। 'Gajapati kings of Orissa' গ্রন্থে অধ্যাপক প্রভাত মুখার্জী এই তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি বলেছেন যে প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে কৃষ্ণদেব রায়ের ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও নির্মলনারায়ণ গুপ্ত বিষয়টি নিয়ে তাঁদের গ্রন্থে (পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, পৃঃ ২৩৪-৩৫) অনেকখানি আলোচনা করেছেন। তাঁরা দুটি বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। এক, পুত্র বীরভদ্রদেব আত্মহত্যা কখন এবং কেন করলেন। দুই— কৃষ্ণদেব রায় কৃষ্ণানদীর ওপারের ভূখণ্ড প্রতাপরুদ্র দেবকে ফিরিয়ে দিলেন কেন। মাধব এ দুটি বিষয়েরই বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা করে গেছেন।

কোণ্ডাবেড়ু দুর্গে শেষ আশ্রয় নিয়েছিলেন বীরভদ্রদেব আর জীবদেবাচার্য। তারপর কী ঘটেছিল তার বর্ণনা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়েই আছে। একমাস অবরোধের পর কৃষ্ণদেব রায়ের সৈন্যরা দুর্গের তোরণ ভেঙ্গে ঢুকে পড়ে আর সেই যুদ্ধে জীবদেবাচার্য নিহত এবং বীরভদ্রদেব বন্দী হন। কৃষ্ণদেব রায় শুনেছিলেন যে খড়্গ চালনায় বীরভদ্র অত্যন্ত পটু। বন্দী বীরভদ্রদেবকে তিনি তাঁর পটুতার পরিচয় দেবার জন্য প্রতিপক্ষ হিসেবে একজন সাধারণ সৈন্যকে দাঁড় করান। বীরভদ্রদেবের প্রবল আত্মসম্মান বোধ তাঁকে আত্মহত্যায় বাধ্য করে। রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের পাটরাণী বীর-ভদ্রদেবের জননী চম্পাদেবীও বন্দী ছিলেন। পুত্রের মৃত্যুসংবাদ এবং সৈন্যবাহিনীর পরাজয় গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবকে কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করে। মাধব বর্ণনা করেছেন যে, বীরভদ্রদেবের আত্মহত্যা কৃষ্ণদেব রায়কেও বিচলিত করেছিল। সন্ধিপত্রের শর্তানুসারে প্রতাপরুদ্রের কন্যা জগন্মোহিনীকে কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ পাশে যে

অংশ প্রতাপরুদ্রের অধিকারে ছিল তা তিনি যৌতুক হিসেবে ছেড়ে দেন এবং চম্পাদেবীও মুক্তি লাভ করেন। কৃষ্ণদেব রায় কৃষ্ণা নদীর এপারে ওড়িষ্যার যে অঞ্চল দখল করেছিলেন তা তিনি প্রতাপরুদ্রদেবকে ফিরিয়ে দেন।

জগন্মোহিনী দেবীর সঙ্গে কৃষ্ণদেব রায়ের বিবাহ ঐতিহাসিক ঘটনা। তাঁর নাকি ডাক নাম ছিল 'তুক্কা'। বীরভদ্রদেব ছাড়া প্রতাপরুদ্রদেবের আরও তিন পুত্র ছিল। প্রতাপরুদ্রদেবের রাণীদের যে নাম পাওয়া যায় তা হোল পদ্মা, পদ্মালয়া, ইলা, মহিলা। জগন্নাথ চরিতামৃত গ্রন্থের লেখক দিবাকর দাস পট্ট-মহাদেবী হিসেবে গৌরীদেবীর নাম দিয়েছেন। অন্যান্য ওড়িয়া গ্রন্থকারেরা আরও দু' একটি করে নাম উল্লেখ করে গেছেন। (সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, 'শ্রীক্ষেত্র', পৃঃ ৫২৪-২৫)

মাধবের পুঁথিতে বীরভদ্র মাতা এবং প্রধান মহিষী যিনি বন্দী হয়েছিল তাঁর নাম 'চম্পাদেবী' বলে উল্লিখিত হয়েছে। অনুমান করি 'পদ্মাদেবী'ই লিপিকর প্রমাদে 'চম্পাদেবী'তে পরিবর্তিত হয়েছেন। যাই হোক, মাধব বর্ণিত যুদ্ধ ও শান্তি সংক্রান্ত ঘটনাগুলিও ইতিহাস-সমর্থিত। পুঁথিখানির প্রামাণিকতা এগুলির দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত।

মাধব বলেছেন ১৫১৯-২০ খৃীঃ থেকেই শ্রীচৈতন্যের মধ্যে দিব্যোন্মাদময় সাত্ত্বিক মহাভাবের বিকাশ হয়। নীলরতন সেন উল্লেখ করেছেন যে ১৫২২ থেকে ১৫৩৩ খৃীঃ—এই বারো বছরকে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ লীলা বলা হয়। (বৈষ্ণব পদাবলীর পরিচয়, পৃঃ ৪৩)। চৈতন্য চরিতামৃতের শ্লোক উদ্ধার করে 'পুরুষোত্তম শ্রীচৈতন্য' গ্রন্থে (পৃঃ ২৮৪) বলা হয়েছে যে শ্রীচৈতন্যের শেষ বারো বছরই 'বিরহ উন্মাদে' কেটে যায়। শেষ বারো বছর ধরলে এর শুরু ১৫২১ খৃীঃ থেকে ধরতে হয়। মাধব আরও পিছিয়ে গিয়ে ১৫১৯-২০ খৃীঃ বলেছেন। আমরা এর মধ্যে কোন অসঙ্গতি দেখি না প্রধানত এই কারণে যে, শ্রীচৈতন্যের মধ্যে এই অবস্থার প্রকাশ আকস্মিকভাবে ১৫২১ খৃীঃ থেকে হয়নি। এর লক্ষণ আরও দু' এক বছরের পূর্বেই দেখা যাচ্ছিল। এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা, বঙ্গীয় বৈষ্ণব ভক্তরা শিবানন্দ সেনের

হাতে পাঠানো লেখা পেয়েও যখন নীলাচলে ফিরে এলেন না তখনই শ্রীচৈতন্য গভীর মনোবেদনা অনুভব করেছিলেন। প্রতাপরুদ্রদেবকে তিনি যে স্নেহ করতেন, এ কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর বীর পুত্রের আত্মহত্যা এবং যুদ্ধে প্রতাপরুদ্রদেবের পরাজয়ও তাঁকে কিছু পরিমাণে অবশ্যই শোকগ্রস্ত করে তুলেছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন যে বিষয়ী জ্ঞানে শ্রীচৈতন্য প্রতাপরুদ্রদেবের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেন। তিনি কিন্তু রাজার পুত্রকে তাঁর কাছে আনতে নির্দেশ দেন আর রাজপুত্রকে আনা হলে তাঁকে আশীর্বাদও করেন। খুবই সম্ভব যে বীরভদ্রদেবই হলেন সেই পুত্র। অতএব তাঁর মৃত্যুকে চৈতন্যের মর্মান্তিক দুঃখবোধ মোটেই অসম্ভব নয়। তিনি নিজেকে পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে নেবার যে আয়োজন করেছেন তার প্রমাণ মেলে শালগ্রাম শিলার পূজার ভার রঘুনাথ দাস গোস্বামীর হাতে তুলে দেওয়া থেকে।

চৈতন্য চরিতামৃতে এই বারো বছরের মধ্যবর্তী এমন বহু ঘটনার উল্লেখ মেলে যেগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও নির্মল নারায়ণ গুপ্ত এই ঘটনাগুলির তালিকা দিয়ে (পৃঃ ২৮৪) ঠিক একই কথা বলেছেন। শ্রীচৈতন্য এই সময় বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন এই উক্তি সম্পূর্ণ কল্পিত। অপরপক্ষে মাধব যে বর্ণনা দিয়েছেন তার বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেশী। তিনি বলেছেন ঐ ১৫১৮-১৯ খৃীঃ থেকে তিনি সদলবলে নামকীর্তনেই বেশি মনোযোগী হন এবং শুধু তাই নয় শ্রীক্ষেত্রের বাইরে বহু জায়গায় নিয়মিতভাবে গিয়ে যে নামকীর্তন করতেন তার বর্ণনা অষ্টম অধ্যায়ে আছে।

মাধব অবশ্য বৈষ্ণব লীলামৃতের সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যের মহাভাবের কিছু বর্ণনা দিয়েছেন। সে বর্ণনা আছে ১১৪ থেকে ১৩৬ শ্লোকে। সেখানে মাধব চৈতন্যের সম্বন্ধে যা বলেছেন তার সংক্ষিপ্ত আক্ষরিক অর্থ হোল—মহাভাবগ্রস্ত অবস্থায় প্রভু গম্ভীরায় বসে থাকতেন আর 'হা কৃষ্ণ' বলে ক্রন্দন করতেন। এই সময় কটি সূত্রে নামজপের সংখ্যা রাখা বন্ধ হয়। মাঝে মাঝেই তিনি কৃষ্ণদর্শনের জন্য দ্রুতবেগে মন্দিরে বা সমুদ্রকূলে চলে

যেতেন। মেঘ দর্শনেও তিনি রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণের জন্য অশ্রুবর্ষণ করতেন। কখনো তিনি মার্কণ্ড বা নরেন্দ্র সরোবরে অবগাহনের জন্য যেতেন। কখনো বা মূর্ছাগ্রস্ত হয়ে ধূলোয় লুটোতেন। এই সময় প্রচুর নৃত্যসহ কীর্তনও করতেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ অন্তলীলায় সমুদ্রে পতন, বদ্ধ তিনটি দরজা পেরিয়ে গরু গাইয়ের মধ্যে পড়ে থাকা, চটক পর্বতকে গিরি গোবর্ধন ভেবে দর্শনে যাত্রা ইত্যাদি যে সব কাহিনীর বর্ণনা করেছেন, তার একটিও মাধবের পুঁথিতে নেই।

শোকক্লিষ্ট গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে যে বৈষ্ণবেরা শ্রীক্ষেত্রে নামগানে সময় অতিবাহিত করতেন, তাঁদের একটু সাহচর্য লাভের জন্য এগিয়ে আসেন আর ১৫২০ সালের রথযাত্রার সময় রথের ওপর থেকে কীর্তন ও নৃত্যরত শ্রীচৈতন্যকে 'প্রভু' বলে ঘোষণা করেন। বিষয়টি অবশ্যই মূল্যবান কারণ গজপতির এই ঘোষণা রথের সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমাগত সহস্র সহস্র যাত্রীদের সামনেই করা হয়েছিল। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, মাধবের বর্ণনামতো এর পূর্বেই শ্রীচৈতন্যের মধ্যে দিব্যোন্মাদের প্রকাশ ঘটেছিল। প্রতাপরুদ্রদেব মনে হয় এই প্রথম প্রকাশ্যে শ্রীচৈতন্যের ভগবৎসত্তা স্বীকার করে নিলেন। আর শুধু নিজেই স্বীকার করলেন না, সারা ভারতেও তা স্বকৃীত হোক এটিও বোধ হয় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। রথের ওপর থেকে তাঁকে 'প্রভু' বলে ঘোষণা করাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অষ্টম অধ্যায়ের শুরুতে 'মৃদঙ্গ' কেন 'খোল' নামেও অভিহিত হয়, মাধব তার একটি সুন্দর কাহিনী শুনিয়েছেন। 'খোল' 'আবরণ' সমার্থক কিন্তু কবে থেকে 'মৃদঙ্গ' 'খোল' বলে অভিহিত হয়, আর কেনই বা তা হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতটি মাধব নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে গেছেন। ঐ ঘটনায় শ্রীচৈতন্য বা তাঁর সহযোগীরা যে বিচলিত হননি বরং ভূমি থেকে মলমূত্রলিপ্ত ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডগুলি তুলে নিয়ে মৃদঙ্গের ওপরই রাখেন, এতে তাঁদের চরিত্রের বৈষ্ণবজনোচিত সহিষ্ণুতা এবং সব কিছুকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করার দিকগুলিও উন্মোচিত হয়েছে। 'খোল' শব্দটি মৃদঙ্গের সমার্থক কীভাবে হয়ে উঠেছিল, এটি তার ইতিহাস হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য।

এই সময় শ্রীচৈতন্যের সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হলেও তিনি যে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকতেন না, মাধব তার সুন্দর বর্ণনাই দিয়েছেন। শেষ বছরগুলি তিনি নামকীর্তন প্রচারেই অতিবাহিত করেছেন। এই অধ্যায়ে মাধব দেখিয়েছেন বছরের বিভিন্ন সময় শ্রীচৈতন্য শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করে বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে চলে যেতেন। এই তীর্থ ক্ষেত্রগুলির মধ্যে আলালনাথ, যাজপুরের বিরাজমন্দির, কোনারকের সূর্যমন্দির এবং ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যাজপুরে শ্রীচৈতন্যকে অন্যতম আত্মীয়জ্ঞানে বিশেষ সম্বর্ধনার আয়োজন করা হোত। বঙ্গীয় শ্রীচৈতন্য চরিতগ্রন্থগুলির মধ্যে জয়ানন্দই স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন যে, রাজা ভ্রমরের অর্থাৎ কপিলেন্দ্রদেবের ভয়ে শ্রীচৈতন্যের পূর্বপুরুষ শ্রীহট্টে চলে গিয়েছিলেন। উপেন্দ্রই কিশোর বয়সে শ্রীহট্টে যান এবং তাঁর বিবাহ ঐখানেই হয়। শ্রীচৈতন্য যে তাঁর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে শ্রীহট্ট গিয়েছিলেন এটিও যেমন সত্য ঘটনা তেমনি পুরী আসার সময় অন্যান্য সঙ্গীদের অলক্ষ্যে একাই যাজপুর ব্রাহ্মণপল্লীতে চলে গিয়েছিলেন (বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবত দ্রঃ), এটিও সত্য ঘটনা। 'পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থে বিষয়টি আলোচনা (পৃঃ ১৬০-৬২) করা হয়েছে। মিশ্র বংশের কোন্ শাখা শ্রীহট্ট চলে গিয়েছিলেন আর কমললোচন (যাঁর গৃহে শ্রীচৈতন্য নীলাচল আগমনের সময় গিয়েছিলেন) যাজপুরে ৫০ বছরের মধ্যে কি করে ফিরে এলেন—ইত্যাদি নানা প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বিমানবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল (এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭১) গ্রন্থের বাংলা ভূমিকাংশে সুখময়বাবু (পৃঃ ৪৬) শ্রীচৈতন্যের পূর্বপুরুষ যাজপুরে ছিলেন, সেখান থেকে শ্রীহট্ট গিয়ে তারপর নবদ্বীপ আসেন—এই সমস্ত ঘটনাবলীকে 'অবিশ্বাস্য' বলে উল্লেখ করেছেন। পঞ্চাশ বছরের কম সময়ে যাজপুর থেকে শ্রীহট্টে চলে যাওয়া আবার শ্রীহট্টে বসবাসের সময় নবদ্বীপে বসতি স্থাপন যে কেন 'অবিশ্বাস্য ব্যাপার' বোঝা শক্ত। আর উপেন্দ্র 'বাস পরিবর্তন' করেননি। তিনি শ্রীহট্টেই ছিলেন, যেমন ছিলেন

শচী দেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তীরাও। জগন্নাথ এসেছিলেন নবদ্বীপ অধ্যাপনা বৃত্তি নিয়ে। পরে নীলাম্বরও আসেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে মুরারি গুপ্ত চৈতন্যকে 'পাশ্চাত্ত্য বৈদিক' বলেন নি, বলেছেন 'বাৎস্য গোত্র'। মুরারির বর্ণনায় আছে—

স্বয়ং সুনীতঃ শতচন্দ্রমা যথা
ভূদেববংশেঽপ্যবতীর্য্য সৎকুলে।
বাৎস্যে জগন্নাথ সুতেত্তি বিশ্রুতিং
সমাপ্নুহি ত্বং কুরু শং ধরণ্যাঃ। [১৷৩৷২০]

—তুমি শতশত চন্দ্রের মত স্বয়ং সুশীতল হইয়া ব্রাহ্মণ বংশে সৎকুলে বাৎস্য গোত্রে অবতীর্ণ হও। জগন্নাথ সুত এই প্রখ্যাতি লাভ কর এবং ধরণীর মঙ্গল বিধান কর। (মদনমোহন গোস্বামী কৃত অনুবাদ।)

এর মধ্যে পাশ্চাত্ত্য বৈদিক উল্লেখ নেই। চৈতন্যের পূর্বপুরুষকে আমরা দাক্ষিণাত্য বৈদিক বলেই গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু এখন জেনেছি এঁরা কান্যকুব্জ থেকে আগত রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বাৎস্য গোত্র সব শ্রেণীর মধ্যে আছে। কিন্তু 'উড়িয়া ব্রাহ্মণ' বলে কোন শ্রেণীর অস্তিত্বই নেই। উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ বহু আছেন। সুখময় বসুর উক্তি, 'চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষ উড়িয়া ছিলেন বলে স্বীকার করা যায় না।' আমাদের সবিনয় উত্তর—ওড়িষ্যাবাসী ছিলেন অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। শ্রীচৈতন্যের পূর্বপুরুষ যাজপুরে বসবাস করতেন এটি স্বীকার করতে বঙ্গীয় পণ্ডিত সমাজের প্রবল অনীহা নিতান্তই অর্থহীন শুধু নয় অনৈতিহাসিক। এখানে যে বিশেষ দিকটি লক্ষণীয় তা হোল মাধবের বর্ণনার সঙ্গে জয়ানন্দের বর্ণনার ঐক্য। মাধব যাকে 'কপিলেশ্বর মহারাজা' (৭৪) বলেছেন, আসলে তিনিই 'ভ্রমর' উপাধিধারী কপিলেন্দ্রদেব।

সোমবংশীয় রাজারা ওড়িষ্যায় ৯ম শতাব্দীর শেষপাদ থেকে ১১শ শতাব্দীর শেষাংশ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই বংশের অন্যতম রাজা প্রথম যযাতি কেশরী যাজপুরে অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য কনৌজ থেকে দশহাজার বৈদিক ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন এবং তাঁদেরই একটি অংশকে বসবাসের জন্য যাজপুরে 'শাসন' বা রাজদত্ত নিষ্কর ভূমি দেওয়া হয়। এটি দশম শতাব্দীর ঘটনা।

কপিলেন্দ্রদেব রাজত্ব করেন ১৪৩৫ থেকে ১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ঐ সময় উপেন্দ্র শ্রীহট্ট চলে যান। কমললোচনের পূর্বপুরুষ শ্রীহট্ট গিয়েছিলেন, এর উল্লেখ কোথাও নেই। উনি দূর সম্পর্কের আত্মীয় এবং তাঁদের বংশ যাজপুর ছেড়ে যায়নি, এটি ভাবতে অসুবিধে কোথায় জানিনে। উপেন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্মণ 'শাসনের' 'সামন্ত' বা প্রধান। বিবাদ বেধেছিল রাজার সঙ্গে প্রধানেরই তাই শাসন-প্রধান উপেন্দ্র শ্রীহট্ট চলে যান সবংশে। জগন্নাথ বিবাহের পর নবদ্বীপ আসেন এটি কেউই অস্বীকার করেনি। অস্বীকারের প্রচেষ্টা শুধুমাত্র একটি বিষয়কে—শ্রীচৈতন্যের পূর্বপুরুষ যাজপুরে বাস করতেন। মাধবের রচনাও এই অভিমতকেই সমর্থন করেছে এবং এটিই স্বীকার্য।

মাধবের বৈষ্ণবলীলামৃত রচিত হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের দু বছর পরে অর্থাৎ ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে সদল বলে শ্রীচৈতন্য কোনারক সূর্যমন্দিরে কীর্তনের জন্য যেতেন এবং সেখানে প্রসাদ গ্রহণ করতেন। এ থেকে প্রমাণিত হোল ১৫৩৫ পর্যন্ত কোনারক মন্দিরে সূর্যপূজো অব্যাহত ছিল।

মাধব বলেছেন শ্রীচৈতন্য যখন ভুবনেশ্বর আসতেন তখন তিনি লিঙ্গরাজ মহাদেবের পুজো করতেন তুলসী আর বেলপাতা দিয়ে। লিঙ্গরাজদেবের পুজোয় তুলসী ব্যবহারের একমাত্র কারণ হোল এই আংশিক শুভ্র এবং আংশিক কৃষ্ণবর্ণ শিবলিঙ্গটি মূলত হরিহরের মিলিত স্বরূপ। কাশী পরিত্যাগ করে শিবপার্বতী অপেক্ষাকৃত একটি নির্জন স্থানে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেবার পর স্থান নির্বাচনে আসেন স্বয়ং পার্বতী। তিনি পূর্বেই শিবমুখে 'একাম্র' ক্ষেত্রের নাম শুনেছিলেন। একটি বিশাল আমগাছের তলায় এখানে মুনি-ঋষিরা সাধনার জন্যে আসতেন, তাই স্থানটি 'একাম্রক্ষেত্র' নামেই পরিচিত ছিল। 'কৃত্তি' এবং 'বাস' নামের দুই অসুরকে গোপালিনী মূর্তিতে পার্বতী হত্যা করেন এবং এখানেই শিবসহ বসবাস শুরু করেন। শিবের প্রার্থনায় শ্রীহরিও তাঁর সঙ্গে একাম্র এই নতুন ক্ষেত্রে থাকতে সম্মত হন। এসব কাহিনী 'স্বর্ণাদ্রি মহোদয়', 'একাম্র পুরাণ', 'কপিল সংহিতা' প্রভৃতি কিছু উপপুরাণে পাওয়া যায়। এই

ক্ষেত্রটি 'হেমাচল', 'স্বর্ণাদিক্ষেত্র', 'ভুবনেশ্বর' ইত্যাদি নামেও খ্যাত। লিঙ্গরাজ মন্দিরের মধ্যে 'কৃত্তি' এবং 'বাস'-এর স্কন্ধে গোপালিনী মূর্তি বিদ্যমান। যেহেতু মহালিঙ্গটি মূলত হরিহরের, তাই তাঁর পূজায় শ্রীচৈতন্য তুলসী এবং বেল পাতা দুই-ই ব্যবহার করতেন।

মাধবের 'বৈষ্ণব লীলামৃত' গ্রন্থের সমগ্র অষ্টম অধ্যায়টি শ্রীচৈতন্য কীভাবে বিভিন্ন স্থানে সপার্ষদ কীর্তন করে বেড়াতেন তারই বর্ণনায় পরিপূর্ণ। আমরা যে বিশেষ ক্ষেত্রগুলির নাম করেছি তা ছাড়াও আরও বেশ কিছু স্থানের উল্লেখ অষ্টম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু যেখানে বর্ণিত হয়েছে, সেখানে দেখা যাবে। পঞ্চসখার মধ্যে এই সংকীর্তন দলের মধ্যে কার কী ভূমিকা ছিল তার বর্ণনাও মাধব দিয়েছেন। কীর্তনের জন্য যে যে স্থানে শ্রীচৈতন্য ভ্রমণ করে বেড়াতেন, তার বর্ণনা পড়লে কখনোই স্বীকার করা সম্ভব নয় যে, শেষ বারো বছর তাঁর 'বাহ্যজ্ঞান ছিল না'। বরং তাঁরই প্রচেষ্টায় কীর্তনের প্রতি সর্বত্র শ্রদ্ধাবোধ ব্যাপক-ভাবেই জাগ্রত হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে।

শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী হতে পারতেন না দু'জন—রঘুনাথ দাস আর স্বরূপ দামোদর। রঘুনাথের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল শালগ্রাম পূজার ভার আর স্বরূপ দামোদর প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন।

এরপর মাধব এসে পৌঁছেছেন তাঁর গ্রন্থের নবম বা শেষ অধ্যায়ে। এখানে বহু ঘটনার উল্লেখ আছে যেগুলির ঐতিহাসিকতা কিছুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ রাখে না।

মাধব বলেছেন ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে রূপ গোস্বামী তাঁর 'বিদগ্ধ মাধব' নাটকখানি নিয়ে পুরী আসেন। বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন, 'কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় ১৪৩৮ শকে 'বিদগ্ধ মাধব' রচনা শেষ হইয়াছিল'। শেষ পর্যন্ত বিমান-বাবু এই নাটকটির সমাপ্তি কাল '১৫৮৯ সম্বৎ অর্থাৎ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ' বলেই তাঁর অভিমত জানিয়েছেন। (চৈ. চ. উ. পৃঃ ৩৮৫)

'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান' প্রণেতা হরিদাস দাস-এর রচনাকাল ১৪৫৫ শকাব্দ (১৫৩৩ খ্রীঃ) বলেছেন। কিন্তু মাধবের মতে ওটি রূপ স্বয়ং নিয়ে আসেন ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রূপের 'বিদগ্ধ মাধব' এবং 'ললিত মাধব'

রচনার একটি পৃষ্ঠপট বর্ণনা করেছেন তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে। বর্ণনাটি আছে অন্ত্যলীলার প্রথম অধ্যায়ে। সেটি পাঠ করলে দেখা যায় যে রূপ যখন নীলাচলে আসেন তখন তাঁর 'বিদগ্ধ মাধব' লেখা চলেছিল। ঐ অধ্যায়ে আছে—

একদিন রূপ করে নাটক লিখন।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন ॥

* * *

"তাঁহা পুঁথি লিখ" বলি একপত্র নিল।
অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হৈল ॥

চৈতন্য যে পাতাটি তুলে দেখেছিলেন, তাতে নাটকের প্রথম অংকই রচনা চলেছিল। শ্রীচৈতন্য ঐ অংশের দ্বাদশ শ্লোক 'কুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে' পড়ে মুগ্ধ হন। রূপ নামক রচনার পরিকল্পনা মনে নিয়েই নীলাচল যাত্রা করেছিলেন। পথে সত্যভামাপুরে রাত্রিবাসের অবসরে তিনি কৃষ্ণ-মহিষী সত্যভামারও নাটক রচনার স্বপ্নাদেশ পান। তখনই 'বিদগ্ধ মাধবের' পর 'ললিতমাধব' রচনার সিদ্ধান্ত নেন।

কবিরাজ গোস্বামী এও বলেছেন যে রূপের রচনা সার্বভৌম-রামানন্দ-স্বরূপ সকলেই দেখেছিলেন আর খুশি হয়েছিলেন। মাধব রামানন্দের কাছে এ ঘটনা শুনে ধরে নিয়েছিলেন যে রূপের নাটক লেখা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তা কিন্তু ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে হয়নি। তখনো নান্দী অংশ রচিত হচ্ছিল। সুপণ্ডিত ও সুকবি রূপের মনে নীলাচল আসার পথেই নাটকটি দানা বেঁধে উঠেছিল তাই নীলাচল পোঁছে দ্রুতগতিতে সেগুলি লিখে চলেছিলেন। নাটকটি সম্পূর্ণ হয় ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে।

রূপ সেবার শ্রীক্ষেত্রে দু'মাস ছিলেন আর বৃন্দাবন প্রত্যাবর্তনের সময় রঘুনাথ দাস তাঁর সহযাত্রী হন। তাহলে প্রমাণিত হলো যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোধানের কিছু পূর্বেই রঘুনাথ দাস গোস্বামী রূপ গোস্বামীর সঙ্গে বৃন্দাবন যান। হরিদাস দাস কিন্তু বলেছেন যে মহাপ্রভু অপ্রকট হবার পর তিনি বৃন্দাবন গিয়েছিলেন, (গৌঃ বৈঃ অঃ পৃঃ ১৩২৫)। বোঝা গেল এটি হরিদাস দাস বাবাজীর অনুমান মাত্র ছিল।

মাধব লিখেছেন ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ শুক্লা একাদশীতে স্বরূপ দামোদরের দেহান্ত হয়। মরদেহ সমাধিস্থ না করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই বর্ণনা থেকে অনুমতি হয় যে, এটিই হয় তো স্বরূপ দামোদরের বাঞ্ছিত ছিল। স্বরূপ দামোদরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখতে গিয়ে ড. মদনমোহন কুমার বলেছেন, 'মহাপ্রভুর তিরোধানের পর স্বরূপ বৃন্দাবনে বাস করেন'। (ভারত কোষ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬০৭)। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান প্রণেতা হরিদাস দাস স্বরূপের তিরোধান সম্পর্কে কিছুই লেখেননি। এ থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে স্বরূপের তিরোধান সম্পর্কে সঠিক তথ্য তাঁরও সংগ্রহে ছিল না। বিমানবাবু বলেছেন, 'স্বরূপ-দামোদর শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর বেশীদিন জীবিত ছিলেন না।' (চৈ. চ. উ. পৃঃ ৩২১, পাঃ টীঃ)। এ সবই অনুমান নির্ভর বক্তব্য কিন্তু মাধব স্বরূপের তিরোধানের শুধু সালই উল্লেখ করেন নি, মাস এবং তিথিটিও উল্লেখ করেছেন। অতএব মাধবের উক্তিই প্রামাণিক।

স্বরূপ দামোদরের প্রায় পরে পরেই তিরোহিত হলেন পঞ্চ-সখার মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ বলরাম দাস। তিনি কীভাবে মৃত্যুবরণ করলেন নবম অধ্যায়স্থিত সেই বর্ণনাটি মর্মস্পর্শী। এই 'যোগ পুরুষে'র দেহ সমুদ্রের তীরেই সমাধিস্থ করা হয় এবং সমুদ্র-তীরবর্তী সেই সমাধি এখনও বিদ্যমান। বলরাম দাসের মৃত্যুর তারিখ আমরা কোন ওড়িয়া গ্রন্থে পাইনি। শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস সাহিত্য একাডেমীর দ্বারা প্রকাশিত (নয়া দিল্লী, ১৯৮২) যে বলরাম দাসের জীবনীটি ইংরেজী ভাষায় রচনা করেছেন তাতে এই কবির জন্ম বা মৃত্যুর কোন সাল তারিখের উল্লেখ নেই, নেই ড. মায়াধর মানসিং রচিত 'ওড়িয়া সাহিত্যর ইতিহাস' গ্রন্থেও। এ থেকে মনে হয়, এপর্যন্ত তাঁর জন্ম বা মৃত্যুর সঠিক তারিখ উদ্ভাবিত হয়নি। মাধব তাঁর মৃত্যুর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

এরপর মাধব শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব কীভাবে হয় এবং তাঁর মরদেহ কোথায় সমাধিস্থ হয় সে সম্পর্কে বিশদ তথ্য দিয়েছেন। নবম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বর্ণনায় তার সম্পূর্ণ ইতিহাস আছে। সংক্ষেপে বিষয়টি হোল এই যে, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্ষয় তৃতীয়ার

দু দিন আগে (তিথিটি মাধব এইভাবে বর্ণনা করেছে—'রুক্মিণী অমাবস্যা সায়ংকালে'—তাহলে অক্ষয় তৃতীয়ার দুদিন আগেই হয়) কীর্তনের সময় নৃত্যরত অবস্থায় বাম পায়ের বড় আঙ্গুলে রাস্তায় পড়ে থাকা ইঁটে বেশ আঘাত পান এবং পথের ওপরেই মূর্ছিত হয়ে পড়েন। শ্রীচৈতন্যের দেহ যে দুর্বল হয়ে পড়েছিল এর ইঙ্গিতও মাধব আগেই দিয়েছেন। সঙ্গীরা তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে মন্দিরের উত্তর পাশে যে মণ্ডপ (যেখানে বৈষ্ণবেরা একত্রিত হতেন), সেখানে শুইয়ে দেন। ঐখানে সারাক্ষণ তাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন জগন্নাথ দাস। পরের দিন দেহে তাপ আসে আর অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। মন্দিরের মধ্যেই তাঁর সেবা-শুশ্রূষা চলে। তারপরদিন অর্থাৎ অক্ষয়তৃতীয়ার দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীচৈতন্য দেহত্যাগ করেন।

এসংবাদ পেয়ে প্রথম আসেন রায় রামানন্দ, তিনি এসেই মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ করতে এবং শ্রীমন্দিরের সেবাপূজো স্থগিত রাখতে নির্দেশ দেন, এরপর একটি চিঠি লিখে তিনি রাজার কাছে অশ্বারোহীর সাহায্যে খবর পাঠান। রাজা মনে হয় কটকেই ছিলেন এবং অক্ষয়তৃতীয়ায় চন্দনযাত্রা দর্শনের জন্য পুরী অভিমুখে রওনা হয়ে আসছিলেন। পথেই তিনি পত্র পান এবং সোজা শ্রীমন্দিরে চলে আসেন।

মরদেহ শ্রীমন্দিরের বাইরে না নিয়ে গিয়ে 'কোইলী বৈকুণ্ঠে' সমাহিত করার প্রস্তাব রায় রামানন্দই দেন। এই প্রস্তাব দেবার কারণ হিসেবে তিনি রাজাকে বলেন—

১। কীভাবে মৃত্যু হয়েছে তা জানালে বঙ্গীয় ভক্তরা তার সঙ্গে সত্য মিথ্যা মিশিয়ে নানা কথা বলতে পারেন।

২। বঙ্গীয় ভক্তরা বঙ্গদেশের মুসলমান শাসককে তাঁদের গুরুর হত্যার কথা বলে উত্তেজিত করে ওড়িষ্যা আক্রমণে প্ররোচিত করতে পারেন।

৩। প্রভু যখন শ্রীমন্দিরেই দেহরক্ষা করেছেন যেখানে দেববিগ্রহগুলির জীর্ণমূর্তি সমাধিস্থ করা হয়, সেখানেই প্রভুর মরদেহ সমাধিস্থ করে দিয়ে 'তিনি

জগন্নাথ দেববিগ্রহে লীন হয়ে গিয়েছেন’ এই কথাই ঘোষণা করা হবে এবং মৃত্যুর প্রকৃত কারণ (এবং সমাধির স্থান) গোপন রাখা হবে।

৪। সামনের রথযাত্রার সময় সমাগত যাত্রীদের কাছে রাজা প্রতাপরুদ্রদেবও ঘোষণা করবেন যে, প্রভু শ্রীচৈতন্য শ্রীজগন্নাথদেবের দারুবিগ্রহে লীন হয়ে গিয়েছেন।

শোকার্ত জগন্নাথ দাস নীরব থাকেন এবং প্রতাপরুদ্রদেব অধোমুখে নীরবে সম্মতি জানান। এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত—যে দু’জন সেবক মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সাহায্যে ‘কোইলী বৈকুণ্ঠে’ মৃত্তিকা খনন করিয়ে রায় রামানন্দ প্রমুখ অন্যান্যেরা শ্রীচৈতন্যের মরদেহ সমাধিস্থ করেন। মন্দিরের উত্তর পাশের যে মণ্ডপে শ্রীচৈতন্য দেহত্যাগ করেন, তার কাছেই পূর্ব-দিকে ‘কোইলী বৈকুণ্ঠে’ যাবার পথ।

এরপর মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং সমস্ত মন্দির সংস্কার (মার্জনা) করার পর দৈনন্দিন পূজার্চনার আয়োজন হয়। চন্দনযাত্রার আনন্দ ম্লান হয়ে যায়—লোকমুখে ঐ সংবাদই ছড়িয়ে পড়ে যে, মহাপ্রভু দেববিগ্রহে লীন হয়ে গিয়েছেন। মাধব নবম অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর তাঁর সঙ্গীদের যে মনোবেদনার বর্ণনা দিয়েছেন তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। এমন কি রায় রামানন্দ এবং প্রতাপরুদ্রদেব সম্পর্কে বর্ণনা প্রমাণ করে যে তাঁদের শোক এতই গভীর এবং মর্মান্তিক হয়েছিল যে তার বাহ্য প্রকাশ প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রতাপরুদ্রদেব সম্পর্কে মাধব তো স্পষ্টই বলেছেন যে তিনি কাষ্ঠনির্মিত মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলেন আর তাঁর দু’ চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছিল।

এরপর রায় রামানন্দের দেহরক্ষার খবরও দিয়েছেন। মাধব তিথি উল্লেখ না করলেও পূর্ববর্তী বর্ণনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়-মান হয় যে ১৫৩৩/বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়ার শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রায় চার-পাঁচ মাস পরে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী বা কৃষ্ণজন্মোৎসবের (যা সে বছর পূর্ববর্তী বৎসরগুলির মতো সাড়ম্বরে কীর্তন সহ অনুষ্ঠিত হয়নি) অল্প কয়েকদিন পরেই

এক সন্ধ্যায় সজ্ঞানে রায় রামানন্দও দেহত্যাগ করেন। ঐ কৃষ্ণাষ্টমী থেকে রামানন্দের দেহত্যাগ যে দূরবর্তী ব্যাপার নয়, অল্প কয়েক দিনের পরেই ঘটে যাওয়া ঘটনা, তা মাধবের বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়।

রায় রামানন্দ এবং রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের আজ্ঞা কেউ অমান্য করেনি। যে দু'জন সেবক মন্দিরে প্রভাতেই উপস্থিত হয়েছিল, তারা ছাড়া মহাপ্রভুর মরদেহ কোথায় সমাধিস্থ হয়েছে অন্য সেবকরা কেউ জানতো না। অবশ্য পঞ্চম সখার বাকী চারজন, রাজা প্রতাপ-রুদ্রদেব-কাশীমিশ্র-কাহ্নাই খুণ্টিয়া-বাসুদেব সার্বভৌম-রায় রামানন্দ আর তাঁর সহচর মাধবের কথা আলাদা। বলরাম তো আগেই গত হয়েছিলেন।

জয়ানন্দ বাম পায়ে ইঁটের আঘাতে ক্ষত সৃষ্টি হওয়ায় শ্রীচৈতন্য দেহরক্ষা করেছেন বলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ কর্তৃক নিন্দিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতো তাঁদের পূজনীয়-পূজনীয়া সকলেই 'অন্তর্হিত' হয়েছেন। রাধাগোবিন্দ নাথ শ্রীচৈতন্য ভাগবত সম্পাদনা প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে এঁদের কখনোই সাধারণ মানুষের মতো মৃত্যু হয় না। তা না হোক, মরদেহ অন্তর্হিত হয়ে যাবে, একথা কেউই স্বীকার করে নেবেন না, নিতেও পারেন নি। তাই ঐ মরদেহ নিয়ে নানা সংশয় সন্দেহ সৃজিত হয়েছে। ঈশ্বরদাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবতে' অক্ষয় তৃতীয়ায় তিরোধান বলেছেন। তাঁর বর্ণনায় মরদেহ গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হয়েছিল বলে পাওয়া যায়। এতোদিন আমাদেরও তাই বিশ্বাস ছিল যে, যেকালে শ্রীচৈতন্য দেহরক্ষা করেন, সেকালে সকলের অলক্ষ্যে মরদেহ গুপ্তপথে মন্দির থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। ঈশ্বরদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' বহু অসম্ভব, অবাস্তব এমন কি অনৈতিহাসিক কাহিনীর সমাবেশ ঘটেছে। তবু আমরা ঐ মরদেহ সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি এ যাবৎ বিশ্বাস করতাম। মাধবের রচনা পাঠ করে এবং আনুপূর্বিক বর্ণনাগুলির প্রামাণিকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে এখন বুঝতে পারছি কেন 'দেববিগ্রহে লীন' হয়ে গিয়েছেন বলে রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং 'কোইলী বৈকুণ্ঠে' কেনইবা শ্রীচৈতন্যের মরদেহ

সমাধিস্থ করা হয়েছিল। ওখানে সমাধিপীঠ বা মন্দির নির্মাণ সম্ভব নয় কারণ সেখানেই জীর্ণ দারুবিগ্রহগুলিকে 'নবকলেবরের' পূর্বেই সমাধিস্থ করার প্রথা আছে। কোইলী বৈকুণ্ঠের দিকে যাবার পথেই শ্রীচৈতন্যের 'পদচিহ্ন' রাখা আছে কেন এখন তার একটি ব্যঞ্জনার্থ আমার কাছে স্পষ্ট। ওদিকে গম্ভীরায় তো শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবহৃত কিছু বস্তুর সামনে অখণ্ড নামকীর্তন চলেছে—ওটিকেই স্মৃতিমন্দির হিসেবে সবাই সম্মান প্রদর্শন করেন।

বঙ্গীয় ভক্তদের সঙ্গে উৎকলীয় ভক্তদের যে বিবাদের কথা উভয় প্রদেশে আলোচিত হয় তার মূল কারণ উভয় গোষ্ঠীর বৈষ্ণবদর্শন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। উৎকলীয় ভক্তরা বৃন্দাবনের দর্শনে আস্থাবান নয় তাই তাঁরা প্রায় সকলেই বঙ্গীয় চরিতকারদের গ্রন্থে অনুপস্থিত। রাগানুগা ভক্তিমার্গের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলা এবং ওড়িষ্যার বিভিন্নস্থানে 'গৌর-নিতাই'র মন্দির প্রতিষ্ঠা অষ্টাদশ শতকে মূলত বলদেব বিদ্যাভূষণের প্রচেষ্টায় ঘটেছে—এটি ঐতিহাসিক ঘটনা অতএব অস্বীকারযোগ্য নয়। এই প্রদেশে রাগানুগা ভক্তিমার্গের পথিক বহুপূর্ব থেকেই ছিলেন রায় রামানন্দ এবং এই মার্গসম্মত সাধনরীতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যে শ্রীচৈতন্যের চাইতে গভীরতর ছিল এই সত্যও অস্বীকারযোগ্য নয়।

যেখানে আমাদের দৃষ্টি বাধা পায় সেখানেই আমাদের কল্পনা-শক্তি প্রবল হয়ে ওঠে। এই কল্পনা কখনো সুস্থ পথ ধরে অগ্রসর হয় কখনও বা তা অসুস্থ মনেরই পরিচয় বহন করে।

শ্রীচৈতন্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং সেই কারণেই তাঁর মরদেহ গোপন করা হয়েছে, এই অভিযোগ অত্যন্ত সাম্প্রতিক কালেই উত্থাপিত হয়েছে। বিমানবাবু তাঁর গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন যে ওড়িয়া ভক্তদের মতে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব বৈশাখ-মাসেই ঘটেছিল (পৃঃ ২৭৩)। মাধবও অক্ষয়তৃতীয়া বলেছেন অতএব বৈশাখ মাসই ঠিক।

'পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' গ্রন্থের রচয়িতাদ্বয় হত্যার সম্ভাব্য কারণ কয়েকটি অনুমান করেছেন। এখন সেগুলি নিয়ে আলোচনা আমরা অপ্রয়োজনীয় মনে করি। কিন্তু তাঁদের উত্থাপিত একটি

প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমাদের কর্তব্য। তাঁরা ঈশ্বরদাসের বক্তব্য উদ্ধৃত করার পরে বলেছেন, "ঈশ্বরদাস বলেছেন, তিনি তাঁর গুরুর কাছে চৈতন্যদেহ বিসর্জনের 'অত্যন্ত গুপ্ত এহু কথা' শুনেছেন। চৈতন্য তিরোধানের পর ঈশ্বরদাসের কাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ একশ' দেড়শ' বছর একথা গুপ্ত রইল কী ভাবে? হয়তো এর আগে যাঁরা জানতেন, রাজদণ্ডের ভয়ে একথা প্রকাশ করতেন না।" (পৃঃ ৩১১-১২)। এ কথা তো সত্যি। তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ কোথায় হয়েছে তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন 'রাম রায় সে স্বামী পাদ, আউ সেবক দুই এক।' (১২৬)। অবশ্য সেখানে প্রতাপরুদ্রদেবও উপস্থিত ছিলেন। এর পরেও মাধব বলেছেন— এহা ন জানে আন কেহি। পড়িলা দুআর ফিটাই'—এ খবর যেন আর কেউ না জানে রামানন্দের এই আদেশ দেবার পর বন্ধ করে রাখা দরজা খোলা হয়।

এই ঘটনার পর রায় রামানন্দ দেহরক্ষা করলেও প্রতাপরুদ্র-দেবের রাজত্বকাল ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল অর্থাৎ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে শ্রীচৈতন্যের তিরোধান হবার পর প্রায় দীর্ঘ সাত বছর রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। মাধব আরও বলেছেন যে কাহ্নাই খুন্টিয়া সহ পঞ্চসখার বাকি চারজন (জগন্নাথ দাস তো কাছেই ছিলেন) এই ঘটনা জানতেন। জগন্নাথ এবং কাহ্নাই ছাড়া অচ্যুত, অনন্ত (এবং সম্ভবত যশোবন্তও) শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে যান। জগন্নাথ সমুদ্রের কূলে বাকী জীবন অতিবাহিত করার কথা জানিয়ে দেন।

দামোদর পণ্ডিতকে স্বরূপ দামোদর যে দেহরক্ষা করেছেন এ সংবাদ নবদ্বীপে পৌঁছে দেবার জন্য পাঠানো হয়েছিল। মাধব আর তাঁর কথা তোলেন নি কিন্তু তিনি অবশ্যই পরে ফিরে এসেছিলেন। এবং প্রকৃত ঘটনা জেনে আবার নবদ্বীপেই ফিরে গিয়েছিলেন। তখনো অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ ছাড়া অন্যদিকে শচীমাতা এবং বিষ্ণুপ্রিয়াও জীবিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের দেহরক্ষা ঘটিত ঘটনার মধ্যে কোন প্রকার অসৎ অভিসন্ধির স্পর্শমাত্রও থাকলে অবশ্যই তা নবদ্বীপে এবং বৃন্দাবনে প্রচারিত হোত এবং জীবিত বৈষ্ণব নেতৃবৃন্দের ক্ষোভ তীব্রভাবেই প্রকাশিত হোত। নরোত্তম ঠাকুরের

আয়োজিত এবং জাহ্নবী দেবীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত খেতুরীর মহোৎসবেও এ প্রসঙ্গ ওঠেনি। ষোড়শ শতকে তা যে হয়নি এটিই প্রমাণিত করে যে সমকালীন বৈষ্ণব নেতৃবৃন্দ এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এই তিরোধানের মধ্যে দুরভিসন্ধির বিন্দুমাত্রও সন্ধান পাননি। সে সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে চারশ' বছর পরে অত্যন্ত সাম্প্রতিক কালে। একাধিক লেখক 'এ বিষয়ে গবেষণাগন্ধী পুস্তকও রচনা করেছেন। একজন তো আরও পুস্তক রচনার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। এ এক ধরণের অসুস্থ মানসিকতা যা এক প্রদেশের মানুষকে অন্য প্রদেশের মানুষদের সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণ করতে প্ররোচিত করে।

মাধবের বৈষ্ণবলীলামৃত রচিত হয়েছিল ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর রচনার মধ্যে শ্রীচৈতন্যকে অবতারত্বে প্রতিষ্ঠা করার কোন প্রবল প্রয়াসই নেই কাবণ সে প্রয়াস শুরু হয়েছিল বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনার সময় থেকে। যিনিই মাধবের মূল ওড়িয়া রচনা পড়ুন না কেন, তিনি যে মাধবের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার যাথার্থ্য স্বীকার করবেন, এতে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। তাছাড়া তিনি অধিকাংশ ঘটনার সাল তারিখ উল্লেখ করার ফলে সেগুলিকে ইতিহাস এবং অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার অবকাশও রেখে গেছেন। এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে আমরা মূল ঘটনাগুলির যাথার্থ্য বিচার করে দেখানোর চেষ্টা করেছি আর যেগুলির কোন সন্ধান পাইনি সেগুলিরও উল্লেখ করেছি। যেমন বল্লভাচার্যের কপিলাশ মঠের মোহান্ত থাকা বা কবীরের শ্রীক্ষেত্রে আসার ঐতিহাসিক সমর্থন আমরা খুঁজে পাইনি। হয়তো মাধব এগুলি অন্য কারও কাছে শুনেই লিখেছেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নয়। মাধবের 'চৈতন্য বিলাসে'র মধ্যে, অন্তত প্রথমাংশে, যে পরবর্তীকালীন সংযোজন ঘটেছে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছি কিন্তু তেমন অভিযোগের অবকাশ এই পুঁথিখানি সম্পর্কে করার সুযোগই নেই। সম্পাদকেরা সংগৃহীত তিনখানি পুঁথির মধ্যে তেমন কোন পাঠভেদ প্যননি।

আর একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শ্রীচৈতন্য ব্রহ্মসংহিতা, গীতগোবিন্দ এবং কর্ণামৃতের

রসাস্বাদন করতেন এর উল্লেখ প্রথম পাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে। পরবর্তী অধ্যায়ের মধ্যেও এই তিনটি গ্রন্থ আস্বাদনের উল্লেখ মেলে একাধিক-বার। কিন্তু এ দু'টির সঙ্গে 'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক-গীতি'র উল্লেখ কোথাও নেই। তাহলে একথা ভাবা কি অসঙ্গত যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এগুলি নিজেই যোগ করেছেন? কোন পূর্ব-সূরীর রচনা থেকেই পাননি। অথচ শ্রীচৈতন্য কোন্ চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করেছিলেন সে নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্কের সমাপ্তি আজও ঘটেনি।

মাধবের 'বৈষ্ণব লীলামৃত' গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়েছে। এখানে সেই গ্রন্থের বিষয়বস্তুগুলি তুলে ধরা হোল একটিমাত্র প্রত্যাশায় —এরপর এই লোকোত্তর ব্যক্তিত্ব এবং আধুনিকতার আদি-প্রবক্তা শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে ভিত্তিহীন অসুস্থ কল্পনাপ্রসূত কাহিনী রচনার অবসান ঘটবে।

শ্রীচৈতন্যের চরিতকার হিসেবে প্রথমেই উচ্চার্য মুরারি গুপ্তের নাম। কিন্তু তাঁর মূল রচনাটি ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে মতান্তরে ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। এতে বিশ্বম্ভরের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত যা কিছু ঘটনা ঘটেছিল তার নির্ভুল বিবরণ পাওয়া যায়। সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত কাহিনীর বর্ণনাও গ্রহণযোগ্য, তার পরবর্তী অংশ সম্পর্কে সন্দেহ আছে। বিতর্কিত হলেও পরবর্তী অংশ যে প্রক্ষিপ্ত এ কথাই বিশিষ্ট গবেষকরা বলেছেন। নীলাচল লীলার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সম্বলিত প্রথম গ্রন্থ রচয়িতা হিসেবে সম্মানের অধিকারী মাধব পট্টনায়ক। ভবিষ্যতের গবেষকরা এঁর কাছে ঋণ অবশ্যই স্বীকার করবেন। একটি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য 'নীলাচল লীলা' মাধব পট্টনায়ক আমাদের দিয়ে গেছেন, এর জন্যে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ।